শুকতারা

একাদশ বর্ষ

ষষ্ঠ সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৬৫

দেব সাহিত্য কুটীর

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ক্যান : শুভঙ্কর ঘোড়ুই

এডিট : হারিদাস পাল

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

"শুকতারা" পড়ছো যে-সব ভাইবোনেরা—

কাগজ

যে কত দামী, তা' তোমরা জানো। সাহিত্য, ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র ভোজ এই কাগজের পাতায় ক'রে পরিবেশন করেছেন বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীরা তোমাদের কাছে। এই কাগজের সম্মান তোমরাই রাখবে—তার সত্যিকারের সদ্ব্যবহার দ্বারা, অর্থাৎ লেখাপড়ায়।

•

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স

(প্রাইভেট) লিমিটেড

কাগজ, বোর্ড, ছাপার কালি, লেখন-সামগ্রী
ইত্যাদি বিক্রেতা

"রঘুনাথ বিল্ডিংস্"—৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-১

•

—শাখা—

কলিকাতার সর্ব্বত্র, উত্তরপ্রদেশ ও আসাম

ফোন—২২-৪৯৯১ পোঃ বক্স—৭৬২ তার—"নোটপেপার"

"শুকতারা"

Approved by the Text-Book Committee, Bihar, as a Supplementary Reader in Secondary and Primary Schools (Children's Monthly Journal).
(Vide Patna Gazette, 30th Dec., 1950).

সূচীপত্র—শ্রাবণ, ১৩৬৫

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	ধর্ম ও শক্তি (চিত্র-পরিচয়)	কুমারী তপতীরাণী	মুখপত্র
২।	বাইশে শ্রাবণ (কবিতা)	কবিশেখর কালিদাস রায়	৩৯১
৩।	উজ্জ্বল পাতা (রেখা ও লেখা)		৩৯২
৪।	জীবনের মূল্য (গল্প)	রবিদাস সাহারায়	৩৯৩
৫।	চটির গল্প (গল্প)	অশোক মুখোপাধ্যায়	৩৯৯
৬।	পথপাগল ছেলে (জীবন কথা)	শ্রীশক্তিপ্রসাদ ঘোষ	৪০৪
৭।	কথার খেয়াল (কবিতা)	শ্রীননীগোপাল দে	৪০৬
৮।	আনন্দ-উচ্ছল সুইট্‌জারল্যাণ্ড (ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়	৪০৭
৯।	ভাগ্যফল (গল্প)	শ্রীদৃষ্টিহীন	৪১৬
১০।	তুষারমানব রহস্য (সত্য ঘটনা)	ডাঃ শ্রীধর সেনাপতি	৪২২
১১।	টার্জানের চতুস্ত্রিংশ অ্যাড্‌ভেঞ্চার (অ্যাড্‌ভেঞ্চার)	সব্যসাচী	৪২৮
১২।	ঝুমরার নরখাদক (শিকার-কাহিনী)	সুষমা সেন	৪৩৫
১৩।	উচিত শাস্তি (কবিতা)	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বারিক	৪৪১
১৪।	ধ্রুব সেন—আজাদী (গল্প)	শ্রীঅলককুমার ঘোষ	৪৪৬
১৫।	অজানার উদ্দেশে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা	৪৫৩
১৬।	খেলার আসর (খেলাধুলা)	শ্রীসাংবাদিক	৪৫৯
১৭।	সোনার বাংলা (চিত্রে ইতিহাস)	শ্রীমধুসূদন মজুমদার	৪৬০
১৮।	বোম্বেটে আর ডানপিটে (রেখা ও লেখা)		৪৬৩
১৯।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি)		৪৬৪
২০।	"জ্যোতিঃপ্রসাদ সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা)		৪৬৫
২১।	দাদুমণির চিঠি		৪৬৬

পাদপূরণ

সুদূরের বাণী	শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৪৩৪

এস্. সি. মজুমদার কর্তৃক দেব-প্রেস, ২৪ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত।

টেলি : বিদ্যাসেবা   পোঃ বক্স : ১১৪৫০

জাতির শিল্প, সংস্কৃতি ও উন্নতির মূলভিত্তি

কাগজ

ভোলানাথ পেপার হাউস লিঃ

হেড অফিস :—৩২এ, ব্রাবর্ন রোড, কলিকাতা—১

ফোন :—২২-১৫৩২, ২২-১৫৩৩, ২২-১৫৩৪ (তিন লাইন)

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী কাগজ, বোর্ড, ছাপার কালি ইত্যাদি
ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করেন

ব্রাঞ্চ :—১৬৭ নং, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা
১৩৪।৩৫ ” ” ” ”
৬৪ নং, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা   ফোন নং : ৩৪-১০২০

মফঃস্বল ব্রাঞ্চ :—এলাহাবাদ, পাটনা, রাঁচি ও কটক

ধর্ম ও শক্তি

ধর্ম ও শক্তি

—কুমারী তপতীরাণী

হঠাৎ কয়েকদিনের অসুখে জমিদার মারা গেলেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পুরানো কর্মচারী বিশ্বহরণকে ডেকে বললেন—আমার বিষয়-সম্পত্তি রইল, রইল আমার ছেলে সুব্রত আর তার বিধবা মা। তোমার উপর সব কিছুর ভার দিয়ে গেলুম।

বিশ্বহরণ সমস্ত দায়িত্ব নিতে রাজী হল। কিন্তু বিধাতা অলক্ষ্যে হাসলেন।

বিরাট সম্পত্তি—কিছুরই অভাব নেই। দু' তিন পুরুষ বসে খেলেও ফুরাবে না। কিন্তু বিশ্বহরণের মনে জাগল দুষ্ট প্রবৃত্তি। সে ধীরে ধীরে নিজে সব কিছু আত্মসাৎ করতে লাগল।

জমিদার-গিন্নী সুরমা দেবী ভগবানের নাম ও পূজার্চনা করে দিন কাটান। ছেলে সুব্রত লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত থাকে। বিষয়-সম্পত্তির কোন খোঁজখবরই তারা রাখে না। এই সুযোগ নিয়ে তাদের পথে বসাবার মতলব করল বিশ্বহরণ।

একদিন সে একটি জাল দলিল নিয়ে এল সঙ্গে করে। ভাবল সিন্দুক থেকে আসল দলিলটি নিয়ে জাল দলিলটি রেখে দেবে সেই জায়গায়।

নির্জন দুপুর। সুরমা দেবী ঘুমুচ্ছেন পাশের ঘরে। চুপি চুপি বিশ্বহরণ সিন্দুকটা খুলে ফেলল।

কিন্তু হঠাৎ কি হল! দলিলটা সিন্দুকের ভিতর থেকে আনতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল বিশ্বহরণ। সুরমা দেবী ঘুম ভেঙে জেগে উঠে ছুটে এলেন সেই ঘরে।

জিজ্ঞেস করলেন—এ কি, সরকার মশাই?

বিশ্বহরণ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গেল। উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল—কিছু না, কিছু না, আপনি মেয়ে মানুষ হয়ে এসবের ভেতর মাথা গলাতে আসবেন না।

পাশের ঘর থেকে ছুটে এল সুব্রত। বিশ্বহরণের সেই সময়কার মূর্তি দেখে বুঝতে পারল—কোন অন্যায় কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে তাদের পুরানো কর্মচারী।

সে তড়িৎ বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশ্বহরণের উপর। সবল বলিষ্ঠ চেহারা বিশ্বহরণের। তার গায়ের শক্তিও কম নয়। কিন্তু অন্যায় কাজে হস্তক্ষেপ করে তার শক্তি গেছে ক্ষয় হয়ে। কিশোর বালক সুব্রতর চেয়েও সে যেন দুর্বল হয়ে গেছে।

সুব্রতর হাতের চাপে বিশ্বহরণের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। অতি কষ্টে সে কাতর কণ্ঠে বলল—আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। আমার শিক্ষা হয়েছে। আজই আমি চলে যাব আমার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

শিশুর ক্ষুদ্র শক্তির কাছে বিরাট পশুশক্তির পরাজয় হল। ধর্মের কাছে অন্যায় চিরকাল এমনি ভাবে পদানত।

একাদশ বর্ষ ● ষষ্ঠ সংখ্যা ● ১৩৬৫, শ্রাবণ

বাইশে শ্রাবণ

—কবিশেখর কালিদাস রায়

সেই বাইশে শ্রাবণ এলো ফিরে
যেদিন তুমি বিদায় নিলে ভাগীরথীর তীরে।
বিদায় নেওয়া তোমার কবি শেষের অভিনয়
বিরাজ তুমি করছ দেখি সারা ভারতময়।
সারাক্ষণই স্মরি তোমায়, বুঝতে নারি মোটে
কেন মিছে তোমার স্মৃতি রাখার কথা ওঠে।
গেলে তুমি এই ভুবনে নতুন ক'রে গ'ড়ে
এই ভুবনেই রয়ে তোমায় ভুল্‌ব কেমন ক'রে!
গঙ্গামায়ের প্রতিটি ঢেউ তোমার কথাই বলে,
প্রতি শিশির কণা প্রাতে তোমার প্রভায় জ্বলে।
শাওন মেঘের প্রতিটি ডাক স্মরায় তোমা কবি।
সকাল বিকাল ছড়িয়ে সোনা স্মরায় রাঙা রবি।
গ্রাম ছাড়া অই শালের ছায়ায় রাঙা মাটির পথ
চাকার দাগের রেখায় রেখায় স্মরায় তোমার রথ।

কূজনে গুঞ্জনে বনের মর্ম্মরেতে শুনি
আজো বয়ে যাচ্ছে তোমার সুরের সুরধুনী।
চলে গেছ চোখের অগোচরে,
দেখ্‌ছি তোমায় ভুবনভরা দেখ্‌ছি ঘরে ঘরে।
সন্ধ্যা প্রাতে তোমার কথা জপ্‌ছে না কোন্ জন!
মশাল জ্বেলে রবিরে কে করাবে দর্শন?

উজল পাতা

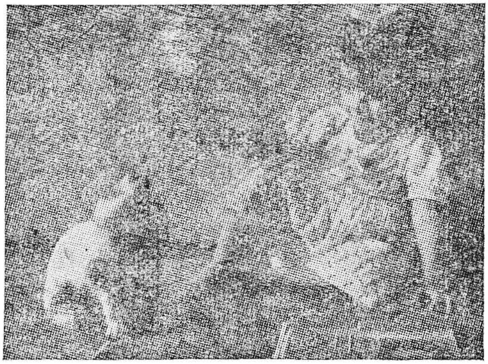

আমার ছবির বই
ভারী মজাদার,
আয় মিনি দেখে যা রে,
মুখ কেন ভার!

ফটো: ভরত নাগ, সাউদার্ণ এভিনিউ; কলিকাতা-২৯

খোকা যাবে বাঘ মারতে
সঙ্গে যাবে কে?
ভোলা কুকুর সঙ্গে যাবে
হাঁপিয়ে পড়েছে!

ফটো: রমেন বাগচী, লোয়ার সারকুলার রোড; কলিকাতা-১৪

জীবনের মূল্য

—রবিদাস সাহারায়

কুটুর-কুটুর-কুট্ !

কিসের শব্দ !

গভীর রাত্রে গদাধরবাবু চমকে উঠলেন। ঘরের কোণে সিন্দুকটার দিকে তাকালেন। শব্দটা যেন ওদিক থেকেই আসছে! ভয়ে তাঁর সর্বশরীর কেঁপে উঠল। সর্বনাশ, ঘরে চোর ঢোকেনি তো! সুইচ্ টিপে আলো জ্বালতে উদ্যত হলেন। কিন্তু থেমে গেলেন একটা কথা ভেবে। চোর যদি ছোরা নিয়ে এসে থাকে? তা হলে কি হবে!

কথাটা ভাবতে গিয়েই গদাধরবাবুর মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। তারপর চোখ মেলে অন্ধকারের ভিতরেই তাকাতে লাগলেন এদিকে ওদিকে।

কুটুর-কুটুর-কুট্ !

আবার শব্দ শোনা গেল।

এ শব্দ নিশ্চয়ই চোরের নয়। তবে সিন্দুকের দিক থেকেই শব্দটা আসছে। এবার তিনি ধীরে ধীরে উঠে আলো জেলে ফেললেন। নাঃ, কিছুই তো ঘরে নেই। তবে এমন শব্দ হল কেন?

কোমর থেকে চাবিটা বের করে সিন্দুকটা খুলতে লাগলেন গদাধরবাবু। তার আগে ঘরের দরজা জানলাগুলো বন্ধ আছে কিনা ভাল করে দেখে নিলেন। হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। শোবার আগে ঘরের দরজা জানলাগুলো বন্ধ করতে তাঁর ভুল হয় না।

সিন্দুক ভর্তি তাঁর টাকা, কাজেই খুব হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হয়। বলা যায় না, দিনকাল বড্ড খারাপ। চোর ডাকাত আসতে কতক্ষণ! তা ছাড়া নিজের বাড়িতেও ঝি চাকর আছে। টাকা দিয়ে নিজের লোককেই বিশ্বাস নেই—আবার অপর লোককে!

ব্যাঙ্কে টাকা রাখতেও ভরসা হয় না। কত ব্যাঙ্ক রাতারাতি লালবাতি জ্বেলে দিচ্ছে। আজকাল একটুও বিশ্বাস নেই কাউকে।

কাজেই সিন্দুকের ভেতর সব টাকা তিনি পুরে রেখেছেন। বন্ধ জায়গায় থেকে থেকে টাকাগুলোতে মরচে ধরে যাচ্ছে—নোটের তাড়াগুলো থেকে ভ্যাপসা গন্ধ বেরুচ্ছে। তবু ভালো। কিন্তু নিজের টাকা পরের কাছে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়।

রোজই ভোরবেলা একবার করে সিন্দুকটা খুলে দেখেন গদাধরবাবু। যথাসম্ভব ঝেড়ে মুছে রাখেন। আর শোবার আগে রাত্রিবেলাতেও।

আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

কিন্তু এই শব্দটা তাঁকে সত্যি ভাবিয়ে তুলল। মনে হচ্ছে শব্দটা আসছে সিন্দুকের ভেতর থেকেই।

খট্ করে সিন্দুকটা খুলে ফেললেন। কিন্তু খুলতেই যে ব্যাপার হল সে ব্যাপারের জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। বুকটা তাঁর ধড়ফড় করে উঠল। মুখটা শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল।

সিন্দুকের ভেতর থেকে লাফ দিয়ে পড়ল একটা নেংটি ইঁদুর।

গদাধরবাবু কয়েকটা নোটের বাণ্ডিল বের করে দেখলেন। তিনি যা মনে করেছিলেন, তাই ; ইঁদুর কেটে দিয়েছে কতকগুলো নোট !

বুকের হৃৎপিণ্ডটা তাঁর ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত নড়তে লাগল। নোটের ছেঁড়া টুকরোগুলো বের করে নিয়ে সন্তর্পণে সিন্দুকটা বন্ধ করে দিলেন। ভালো করে দেখে নিলেন আরো কোন ইঁদুর আছে কিনা। সিন্দুক বন্ধ করার সময় কখন কোন্ ফাঁকে যে ইঁদুরটা ঢুকে পড়েছিল তা তিনি টেরই পাননি।

নোটের টুকরোগুলো একটি ন্যাকড়ায় জড়িয়ে রেখে বাকী রাতটা জেগে রইলেন। দুশ্চিন্তায় ঘুম এল না। ন্যাকড়াটা খুলে একবার টুকরোগুলো বিছানায় পেতে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেন—আবার বেঁধে রেখে দেন। ভাবেন, টাকাগুলো বুঝি তাঁর গেল—এগুলো হয়তো আর চালানো যাবে না।

যদি সত্যি তাই হয় ! যদি চালানো না যায় ! তবে কি হবে ! নির্ঘাৎ তিনি হার্টফেল করবেন।

ইস্, ইঁদুরটা তাঁর কি সর্বনাশই করল ! টাকাগুলো না খেয়ে যদি তাঁর গা থেকে কিছুটা রক্ত খেয়ে নিতো তবু এত দুঃখ হতো না।

মনে মনে ভাবতে লাগলেন গদাধরবাবু। ইঁদুরগুলো কেন কাগজ খায় ? কেন মানুষের রক্ত খায় না ? যদি ওরা রক্তপায়ী হতো তবে তো আজ তাঁর এত বড় সর্বনাশ হতো না !

রাত ভোর হতে না হতেই গদাধরবাবু বিছানা থেকে উঠলেন। হাতমুখ ধুয়েই তাড়াতাড়ি ছুটলেন পচুবাবুর বাড়ির দিকে। ছেঁড়া নোট-জড়ানো ন্যাকড়াটা পচুবাবুর হাতে দিয়ে বললেন—পচু ভাই, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

পচুবাবু আঁতকে উঠে বললেন—কেন, কি হয়েছে ?

—ওটা খুলেই দেখো না।

পচুবাবু ভয়ে ভয়ে ন্যাকড়াটা খুলতে লাগলেন। ভাবলেন, না জানি ওর ভেতর কি সর্বনাশের ব্যাপার দেখবেন।

কিন্তু খুলেই হেসে উঠলেন পচুবাবু।—ওঃ, এই কয়েকটা নোট! ইঁদুরে কেটেছে বুঝি ? তা'তে আর কি হয়েছে, এগুলো ফেলেই দাও।

চোখ ছানাবড়া করে জবাব দিলেন গদাধরবাবু—সর্বনাশ, তুমি কি বলছ পচু ? টাকাগুলো ফেলে দেব ? তার চেয়ে বলো না কিছুটা গায়ের মাংস কেটে ফেলে দিই!

পচুবাবু বললেন—এতো টাকা তোমার খাবে কে ? সব তো এমনি ভাবে নষ্ট হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং কিছু দানধ্যান করো—পুণ্যি হবে।

গদাধরবাবু জিভ কাটলেন—ছিঃ, অমন অলুক্ষণে কথা বলো না। টাকা কখনো বিলিয়ে দিতে আছে ? এক লাখ টাকার থেকে একটি পয়সা যদি তুমি দান করো তবে কি আর তা এক লাখ টাকা থাকবে ?

কথা শুনে হাসতে লাগলেন পচুবাবু।

গদাধরবাবু তাঁর দুটি হাত ধরে বললেন—ভাই, তোমাদের তো ব্যাঙ্কের সঙ্গে রোজ লেন-দেন হয়—আমার এই টাকা কয়টা যদি ব্যাঙ্ক থেকে পাল্‌টিয়ে আনতে পার তবে চিরকাল তোমার কাছে কেনা হয়ে থাকবো।

পচুবাবু বললেন—আচ্ছা দেখবো চেষ্টা করে। বলে টুকরো নোটগুলো বাক্সে পুরে রেখে দিলেন।

৮

এর পর কয়েকদিন কেটে গেছে। গদাধরবাবু খোঁজ নিয়েছেন—পচুবাবু নোটগুলো কারেন্সীতে জমা দিয়েছেন—এখনো খবর পাওয়া যায়নি। তাই মুখ ভারী করে বসে আছেন। যদি তাঁর টাকার খবর আসবার আগেই কারেন্সী উঠে যায় ? তবে ?

এমন সময় একটা লোক তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন —কি চাই ?

লোকটি হাত জোড় করে বলল—দেখুন, আমি বড় বিপদে পড়ে এসেছি। একটি

মাত্র ছেলে, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছি। তিন মাস ধরে অসুখে ভুগছে। ডাক্তাররা বলেছেন—ওর গায়ে রক্ত দিতে হবে। হাসপাতালে রক্ত নেই—তাই বাইরে থেকেই কিনে দিতে হবে। কিন্তু আমার কাছে একটা টাকাও নেই। তাই এসেছি আপনার কাছে সাহায্য চাইতে। দয়া করে আমাকে কয়েকটা টাকা দিয়ে সাহায্য করুন—নইলে আমার ছেলেকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না।

গদাধরবাবু রেগে উঠে বললেন—টাকা! টাকা আমি কোথায় পাবো? আমি কি ব্যাঙ্ক না টাকার গাছ?

লোকটি কাকুতি মিনতি করে বলল—শুনেছি আপনার টাকার অভাব নেই। তাই এসেছি। যদি আমার ছেলের অবস্থার কথা ভেবে অন্ততঃ দশটি টাকা—

আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই গদাধরবাবু বললেন—দশটা! দশটা টাকা কি কম? যাও যাও, একটা টাকাও আমার কাছে নেই।

এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলেন পচুবাবু। তাঁর হাতে কয়েকটা দশ টাকার নোট। বললেন—নাও হে গদাধর, তোমার ভাগ্যি ভাল। ব্যাঙ্ক থেকে তোমার সবগুলো ইঁদুর-কাটা নোটের বদলে নতুন টাকা পাওয়া গেছে।

আগন্তুক লোকটি সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইল ঐ নোটগুলোর দিকে। গদাধরবাবু তাড়াতাড়ি টাকাগুলো পচুবাবুর হাত থেকে নিয়ে লুকিয়ে ফেললেন।

পচুবাবু জিজ্ঞেস করলেন—লোকটা কি চায়?

গদাধরবাবু গলার স্বর চড়িয়ে জবাব দিলেন—ছেলের অসুখ, গায়ে রক্ত দিতে হবে। তাই দশটা টাকা চাইতে এসেছে আমার কাছে। আমি যেন দানসত্র খুলে বসেছি।

পচুবাবু বললেন—এত চটছো কেন? দিয়ে দাও না এর থেকে দশটি টাকা। এ টাকাগুলো তো তোমার যেতেই বসেছিল।

মুখ গম্ভীর করে জবাব দিলেন গদাধরবাবু—তাই বলে দিয়ে দেবো? বাঃ, বেশ লোক তুমি!

লোকটি কাতর স্বরে বলতে লাগল—দেখুন বাবু, রক্তের অভাবে আমার ছেলে মারা যাবে। ডাক্তার বলেছেন—রক্ত না পেলে ভাল ফল খাওয়াও, ভাল জিনিস খাওয়াও। কিন্তু তাতেও যে টাকা লাগবে বাবু। নিজেরাই খেতে পাই না—টাকা পাব কোথায়?

লোকটি কেঁদে ফেলল। পচুবাবুর চোখও ছল ছল করে উঠল। তিনি গদাধর-বাবুকে বললেন—ভাই, তোমরা যদি সাহায্য না করো তবে এই সব গরীব বাঁচবে কি করে?

এবার ভয়ানক লজ্জা পেলেন গদাধরবাবু। মাথা চুলকাতে লাগলেন—গা চুলকাতে লাগলেন। কি যেন ভাবতে লাগলেন মনে মনে। তারপর বললেন—একান্তই সাহায্য করতে হবে? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি সাহায্য করব। কিন্তু টাকা দিতে পারব না। বরং গায়ের কিছুটা রক্ত দিয়ে আসতে পারি ওর ছেলের জন্য।

অগত্যা সেই ব্যবস্থাই হল। গদাধরবাবু একটি পয়সাও বার করলেন না গাঁট থেকে। পরদিন হাসপাতালে গিয়ে রক্ত দিয়ে এলেন।

তারপর কেটে গেল একদিন—দু'দিন—তিন দিন।

গদাধরবাবু উসখুস করতে লাগলেন।

তাঁর যেন মনে হতে লাগল—তিনি আর বাঁচবেন না। তাঁর গায়ের রক্ত সব ফুরিয়ে গেছে। হাসপাতালের লোকেরা তাঁর গা থেকে সব রক্তই নিয়ে গেছে চুরি করে।

এক সময় হঠাৎ জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন গদাধরবাবু—চোর, চোর, দুনিয়ার সবাই চোর!

চেঁচামেচি শুনে ছুটে এল বাড়ির সবাই। জিজ্ঞেস করল—চোর কোথায়? কোথায় চোর?

গদাধরবাবু বললেন—চোর কোথায় না আছে? চোর দুনিয়ার সর্বত্র। সব চোরেরা মিলে আমাকে মেরে ফেললে—আমাকে শেষ করে ফেললে। আমি আর বাঁচবো না।

উৎকণ্ঠার বদলে সকলের মনে জেগে উঠল কৌতূহল। জিজ্ঞেস করল—কেন তুমি এমন অলক্ষুণে কথা বলছ?

গদাধরবাবু বললেন—অলক্ষুণে কথা নয়, আমার বুকটা যেন কেমন করছে। আমি বুঝি এক্ষুণি মারা যাবো—হার্টফেল করবো।

গদাধরবাবুর অমন অবস্থা দেখে একজন তক্ষুণি ছুটে গেল ডাক্তার ডেকে আনতে।

এমন সময় পচুবাবুও হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হলেন। তাঁকে দেখে গদাধরবাবু বললেন—ভাই পচু, তোমার কথা সেদিন না শুনে বড়ই ভুল করেছি। সেদিন যদি রক্ত না দিয়ে টাকাই দিতাম তবে কি আর আজ এমন অবস্থা হতো? রক্ত গেলে শরীরে কি কিছু থাকে? আমি বুঝি আর বাঁচবো না। টাকার চেয়ে মানুষের জীবনটা যে বড় তা এতদিন বুঝতে পারিনি ভাই।

এমন সময় ডাক্তার এসে উপস্থিত হলেন। ডাক্তারকে দেখেই চমকে উঠলেন গদাধরবাবু—একি, ডাক্তার কেন? তবে কি সত্যি আমি মরে যাবো? আমি কি আর বাঁচবো না?

ডাক্তারের দু'হাত চেপে ধরলেন গদাধরবাবু। বললেন—ডাক্তার, আমাকে বাঁচাও। আমি বুঝি এক্ষুণি মরে যাবো।

ডাক্তারকে দেখেই চমকে উঠলেন… …

ডাক্তারও হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন একটু। বারবার পরীক্ষা করেও কোন রোগের হদিশ পেলেন না। শেষে হতাশ হয়েই বললেন—আপনার কোন রোগ হয়নি গদাধরবাবু। আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ। যেটুকু রোগ—সেটুকু শুধু আপনার মনের।

এবার ক্ষেপে উঠলেন গদাধরবাবু। বললেন—কি বললে ডাক্তার? আমার কোন রোগ নেই? কেমন ডাক্তারী শিখেছ তুমি! শুধু ফাঁকি দিয়ে টাকা নেবার মতলব? বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। এক পয়সা ভিজিটও তোমাকে দেবো না।

ডাক্তার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। মনে মনে ভাবতে লাগলেন—লোকটা কি পাগল না আর কিছু!

চটির গল্প

—অশোক মুখোপাধ্যায়

কুণালের একজোড়া জুতো ছিল। কিন্তু এটা তার জন্যে কেনা হয়নি। জুতো-জোড়ার বয়েস যে কত, সঠিক জানা যায় না। তবে শোনা যায় ওর বাবা এটা প্রথমে পরতেন। তারপর পরত ওর বড়দা। বড়দার ছোট হয়ে যেতে সেটা ক্রমান্বয়ে মেজদা এবং সেজদার যুগ পার হয়ে আপাততঃ তার ওপর এসে বর্তেছে।

মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ এর প্রাচীনত্বের খোঁজ পেলে নিশ্চয় কদর করতেন। কারণ জুতোজোড়া শুধু লোলচর্মই হয়নি, তার আকৃতি থেকে শুরু করে দেহবর্ণেরও আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিন্তু এমন মুশকিল কুণালের, ওটা ছেঁড়ে না কিছুতেই। অনেক চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম। জুতোজোড়া নাকচ করে দেবার মত কোন কারণই সে সৃষ্টি করে উঠতে পারল না।

তখন অনেক বলে-কয়ে একজোড়া স্যাণ্ডেল কেনার আরজি পাশ করিয়ে নিল ও। ইদানীং সে ধুতি পরতে শুরু করেছে। ধুতির সঙ্গে স্যাণ্ডেল ছাড়া মানায় না—এই অজুহাতে সে মামলা জিতে নিল।

স্যাণ্ডেলজোড়া বেশ সস্তাতেই কিনল ও। অন্ততঃ ওর ধারণা তাই। দোকানদার ছ'টাকা দাম চাইতে ও বলেছিল তিন টাকা। আশ্চর্য, তাতেই রাজী হয়ে গেল দোকানী। কুণালও বিরাট এক দাঁও মারার আনন্দ নিয়ে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরল।

ওদের বাড়ির সামনের ফুটপাথটাতে এক বুড়ো বসে রোজ। জুতো সারানই তার কাজ। কুণালকে রোজ বেরোবার পথে এতদিন একবার করে হাজিরা দিতে হত সেই বুড়োর কাছে—তার প্রাগৈতিহাসিক জুতোজোড়া পালিশ করিয়ে নিতে। কাঠের স্ট্যাণ্ডটার ওপর এক পা রেখে সঙ্‌ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। তাতে পাকা আধঘণ্টা নষ্ট হত। পালিশের সঙ্গে সঙ্গে বুড়োর মুখে তাকে শুনতে হত জুতো-জোড়ার গুণগনার অনর্গল প্রশংসা। পুরনো দিনের জিনিস—তার দামই নাকি আলাদা। যেমন মজবুত, তেমনি খুবসুরৎ। বুড়ো বিড়বিড় করত আর রঙ লাগাত। হাজার বলে কয়েও একটু তাড়াতাড়ি করানো যেত না।

কুণাল খুশি হয়ে ভাবল, এবার থেকে পালিশের ঝঞ্চাটটা অন্ততঃ মিটল।

বাড়ি ঢুকে প্রথমে ও পড়ল বড়দা'র মুখোমুখি। কম দামী জিনিস বড়দা

দু-চোখে দেখতে পারেন না। তাঁর ধারণা, বেশী দাম না হলে জিনিস ভালোই হতে পারে না।

বড়দা বললেন, দেখি, দেখি স্যাণ্ডেলটা ?

কুণাল এগিয়ে ধরল স্যাণ্ডেলজোড়া। বললে, দেখতো বড়দা, কেমন হয়েছে ?

বড়দা নেড়েচেড়ে বললেন, ভালোই তো মনে হচ্ছে। দাম নিলে কত ?

তিন টাকা।

তিন টাকা ? বড়দার ভ্রূ-জোড়া ধনুকের মত হল, তিন টাকা, তাই বল। এজন্যেই এমন হাল্কা মনে হচ্ছে। আর দেখতে বড্ড সেকেলে। কত বললি, তিন টাকা নিয়েছে ? কেন, আর কিছু টাকা বেশী দিয়ে একটু ভালো দেখে কিনলেই হত ! এমন যাচ্ছেতাই একটা জিনিস পায়ে দিয়ে কোলকাতার রাস্তা দিয়ে হাঁটবি তুই ! দেখবি, ঠিক ভিড় জমে যাবে।

কুণাল বলতে যাচ্ছিল, কেন, দেখতে খারাপ কিছু তো নয় ?

বড়দা থামিয়ে দিলেন ওকে, না, খারাপ নয় ! তারপর একটু ভেবে বললেন, বরং একবার দেখে আয় না, কিছু টাকা বেশী দিয়ে এটা বদলে আনা যায় কিনা ?

কুণাল কোন জবাব না দিয়ে পালিয়ে বাঁচল।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পথে ও পড়ল মেজদার সামনে। মেজদা আবার সৌখিন জিনিস একদম দেখতে পারেন না। দেখতে যেমনই হোক, মজবুত আর টেঁকসই জিনিসের কদর তাঁর কাছে সব চেয়ে বেশী।

মেজদা বললেন, তোর হাতে ওটা কিরে ?

অগত্যা কুণালকে থামতে হল। বললে, স্যাণ্ডেল।

স্যাণ্ডেল ! মেজদা অবাক হয়ে বললেন, স্যাণ্ডেল হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন ? ও কি হাতে রাখবার জিনিস !

না, মানে নতুন। কিনে আনলাম।

কিনে আনলি ? কই দেখি ? মেজদা এগিয়ে এলেন।

কুণাল তুলে ধরল স্যাণ্ডেলজোড়া। উজ্জ্বলমুখে বললে, অনেক দেখে-শুনে কিনলুম। দেখতে চমৎকার—তাই না ? আর দামও বেশ সস্তাই নিয়েছে।

সস্তা—কত শুনি ?

তিন টাকা।

তি—ন টা—কা ! মেজদা ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন, তিন টাকা সস্তা হল বুঝি ! এক টাকার স্যাণ্ডেল তিন টাকায় গছিয়েছে তোকে বোকা পেয়ে।

এক টাকা! ক্ষীণকণ্ঠে বললে কুণাল, এক টাকায় স্যাণ্ডেল পাওয়া যায়! এক জোড়া তো দূরের কথা, একটা স্যাণ্ডেলও দেবে না এক টাকায়।

না দেবে না! মেজদা ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে তুলে নিলেন স্যাণ্ডেলজোড়া। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন চোখের সামনে, এই তো পচা চামড়া, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ভেতরে পিজবোর্ড্‌। এর দাম এক টাকা নয়তো কি চোদ্দ টাকা হবে?

তারপর একটু টিপেটুপে বললেন, আর এ তো একদম পল্‌কা রে। দুজনে ধরে বার কয়েক টানলেই ছিঁড়ে যাবে।

না না বেশ শক্ত! কুণাল আপত্তি করল।

শক্ত? বেশ, তুই ওদিকটা ধরে টান—আমি এদিকটা ধরে টানছি। দেখি কেমন শক্ত!

কুণাল বললে, বারে, অমনি টানলে তো ছিঁড়বেই। কিন্তু টানতে যাবে কেন? স্যাণ্ডেল হচ্ছে পরবার জন্য, থাকবে পায়ে—টানাটানি তো আর হতে যাচ্ছে না?

বোকা! মেজদা অবজ্ঞার হাসি হাসলেন। থাকলই বা পায়ে। তাই বলে কি আর টান পড়বে না ওর ওপর? ধর ভিড়ের মধ্যে যাচ্ছিস, কেউ পা দিয়েছে তোর পায়ের ওপর, পা'টা টানতে গেলি—তখন টান পড়বে না? আবার হয়তো বৃষ্টির দিনে কাদায় পা পড়ে গেল। তখন পা টানতে হবে না? তুই এক কাজ কর। এটা ফেরত দিয়ে আয়। ফেরত দিয়ে একজোড়া শক্ত দেখে স্যাণ্ডেল কিনে আন। কেনার সময় বলবি যেন গণ্ডার কি মোষের চামড়ায় তৈরী হয়। বুঝলি?

তুই এক কাজ কর। এটা ফেরত দিয়ে আয়।

দেখি। বলে কুণাল বিরস মুখে সরে গেল সেখান থেকে।

বড়দা এবং মেজদা—দুজনকেই কুণাল সেদিন সারাটা দিন এড়িয়ে চলল। কিন্তু বিকেলের জলখাবারের সময় দু-জনেরই মুখোমুখি পড়তে হল তাকে।

রান্নাঘরে ঢোকবার মুখে কুণালের স্যাণ্ডেলজোড়ার দিকে চোখ পড়ল দু-জনেরই।

খেতে বসে বড়দাই কথা বললেন প্রথমে, স্যাণ্ডেলটা বুঝি ফেরত দিসনি ?

কুণাল নিরুত্তর রইল।

বড়দা বললেন মাকে উদ্দেশ্য করে, নাও মা এবার রাত্রির ঘুমের দফা রফা হল।

মা বিস্মিত হয়ে তাকালেন, কেন ?

কেন ? গম্ভীরস্বরে বড়দা বললেন, কুণালের ঐ স্যাণ্ডেলজোড়া দেখেছ ? গন্ধে চারদিক মাৎ করে রেখেছে। ওতে ঘুম আসবে কারুর ? এমনিতেই এই। তার ওপর জলে ভিজলে তো কথাই নেই। হাওয়া পর্যন্ত দূষিত হয়ে যাবে। শেষে না আবার অসুখবিসুখ শুরু হয়ে যায় বাড়িতে।

মা তেমন আমল দিলেন না বড়দার কথায়। বললেন, কথা শোন। রাজ্যশুদ্ধ লোক স্যাণ্ডেল পরছে, কই—এমন তো কারুর হয় বলে শুনিনি !

এমন স্যাণ্ডেলও কেনে না কেউ! দোকানদার আর কারুর কাছে বেচতে পারেনি, শেষে কুণালকে পেয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে গছিয়ে দিয়ে বেঁচেছে।—বড়দা বললেন।

মেজদা এতক্ষণ কিছু বলেননি। এবার তিনি মুখ খুললেন, ও-সব গন্ধ-টন্ধ কিছু নয়। আসল কথা হল স্যাণ্ডেলটা একদম পল্‌কা। দু'দিনেই যাবে। বড় জোর তিনটে দিন টিঁকতে পারে। আর রোজ রোজ একবার করে ষ্ট্র্যাপ তো ছিঁড়বেই। আগেই বলেছিলাম ও কিনতে পারবে না, বড় কাউকে যেন নিয়ে যায় সঙ্গে করে!

কুণাল মৃদু আপত্তি করে বললে, কেন, বিজনও তো এই স্যাণ্ডেলই কিনেছে। তারটা তো—

মেজদা এক ধমকে থামিয়ে দিলেন ওকে, এই স্যাণ্ডেল কিনেছে বলেই ফেলও করেছে। রোজ রাস্তায় স্যাণ্ডেলের ষ্ট্র্যাপ ছিঁড়েছে আর সারিয়ে নিতে গিয়ে কলেজে হয়েছে লেট। ক্লাস কামাই করলে পরীক্ষায় ফেল হবে না!

কুণাল বললে, ফেল হয়েছে অন্য কারণে। তার সঙ্গে স্যাণ্ডেলের সম্পর্ক কি ?

অনেক সম্পর্ক আছে।—মেজদা বললেন, যাক, তুই কালই ওটা পাল্টে একজোড়া টেঁকসই স্যাণ্ডেল কিনে আনবি—বুঝলি ?

বড়দা বললেন, এখন ফেরত নেবে নাকি! নোংরা হয়ে গেছে না ?

যদি ফেরত নাই নেয়, মেজদা চিন্তিত ভাবে বললেন, তাহলে এক কাজ করবি। কোন মুচির দোকানে গিয়ে কয়েকটা বুটপিন লাগিয়ে নিবি। আর ষ্ট্র্যাপ্‌গুলো পাল্টে বেশ পুরু চামড়ার ষ্ট্র্যাপ্‌ ফিট করে নিবি।

মা বললেন, অত সব করতে যা খরচ পড়বে, তাতে আরেক জোড়া নতুন স্যাণ্ডেলই হয়ে যাবে হয়তো।

কুণালও সাহস পেল এবার। বললে, বুট-পিন লাগাবে না আরও কিছু! যেখান দিয়ে যাব—ঠক্ ঠক্ শব্দ উঠবে ঘোড়ার খুরের মত। শেষে লোকে তাকিয়ে দেখবে কিনা জুতো নয়, বুট নয়—স্যাণ্ডেল থেকে উঠছে ঐ ভীষণ আওয়াজ।

না, বুট-পিন লাগানো ঠিক হবে না। তাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে শ্লিপ করে পড়ার ভয় রয়েছে। বড়দা বললেন।

মা ভীতস্বরে বললেন, ও বাবা, ওসবে দরকার নেই। প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ুক আর কি শেষে! তার চেয়ে বরং বাড়িতেই ও পরুক এটা। বাইরে পুরনো জুতো-জোড়াই পরে যাবে।

কুণাল বললে কাঁদকাঁদ স্বরে, তাহলে আর এটা কেনার দরকার ছিল কি! আগের জুতো আমি আর পরব না কিছুতেই—খালি পায়ে থাকলেও না।

বড়দা সেদিকে কর্ণপাত করলেন না। মাথা নেড়ে বললেন, বাড়িতে পরবার জন্যে তো খড়মই রয়েছে। তার জন্য শুধু শুধু এটাকে রেখে ঐ গন্ধের সৃষ্টি করে লাভ কি! তার চেয়ে ওটা ফেলেই দে। বাড়ির পেছনে যে গর্তটা আছে, ওখানেই ফেলে দে। জায়গাটা ভরাট হবে।

বড়দার কথা শেষ হতে না হতেই বাইরে থেকে কুণালের ছোট ভাইয়ের চিৎকার শোনা গেল, ছোড়দা ছোড়দা, দেখে যাও তোমার নতুন স্যাণ্ডেল ভুলু খেয়ে ফেলছে। এই হঠ্ হঠ্—

সবাই হুড়োহুড়ি করে বাইরে এল। এসে দেখে কুণালের স্যাণ্ডেলের কঙ্কালটা শুধু পড়ে আছে। ষ্ট্র্যাপগুলোর অধিকাংশই গিয়েছে ভুলুর পেটে। পরম আরামে দু'চোখ বুজে তখনও সে অবশিষ্টাংশের নিধনে ব্যস্ত।

মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, যাক্ আপদ গেল। এটা নিয়ে যা সমস্যার সৃষ্টি করে বসেছিলি তোরা! নাওয়া-খাওয়াই বন্ধ হতে যাচ্ছিল প্রায়।

মেজদা কুণালকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বললেন, ঘাবড়াস নে কুণাল। সোল দুটো ঠিক আছে। এখন ওর ওপর ভালো চামড়া দেখে ফিতে লাগিয়ে আনলেই হবে।

কুণাল হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। দুঃখ, রাগ, ক্ষোভ—সব মিলিয়ে সে-এক বিচিত্র মানসিক অবস্থা হয়েছে ওর। হঠাৎ সে এক লাফে উঠোনে নেমে স্যাণ্ডেলের সোল-দুটো তুলে সাঁ করে ঘরের পেছন দিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললে, দরকার নেই আমার স্যাণ্ডেলে। জায়গাটাই ভরাট হোক!

পথপাগল ছেলে

—শ্রীশক্তিপ্রসাদ ঘোষ

সে অনেকদিন আগেকার কথা, আজ থেকে হাজার বছরেরও বেশী হবে। মালাবার দেশের আঠার বছরের এক তরুণ—বেদ বেদান্ত তার কণ্ঠস্থ। সুন্দর চেহারা, সুমিষ্ট গলার স্বর—বিনয়ী নম্র। মা বাবার একমাত্র সন্তান—একান্ত স্নেহে মানুষ। কিন্তু তবুও তার মন বসে না ঘরে। মায়ের কাছে বলে—"মা, আমি চলে যাব।"

মা চমকে উঠে শুধান—"কোথায় যাবি রে?"

"আমি সন্ন্যাসী হয়ে অনেক দূরে চলে যাব।"

"ষাট, বালাই! অমন কথা বলতে নেই বাবা। কোন্ দুঃখে সন্ন্যাসী হতে যাবি, বাছা আমার!" গভীর স্নেহে মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

ছেলের মন ভুলে যায় মায়ের স্নেহে। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য!

আবার তার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

বাড়ীর পাশেই নদী। ছেলে রোজ নদীতে স্নান করে—মা থাকেন কূলে দাঁড়িয়ে। এমনি একদিন স্নান করবার সময় এক অতিকায় কুমীর এসে ছেলের পা কামড়ে ধরে জলের তলায় টেনে নিয়ে গেল। তীব্র আর্তনাদ করে মা জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অন্যান্য বহুলোক, যারা নদীতে স্নান করছিল তারাও এসে পড়ে। জল তোলপাড় করে অনুসন্ধান চলে, কিন্তু খোঁজ পাওয়া যায় না। সন্তান-হারা মা'র বুকফাটা আর্তনাদে বাতাস যেন কেঁদে ওঠে।

এমন সময় হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হন জটাজূটধারী তেজপুঞ্জদেহ এক সন্ন্যাসী। ধীর গম্ভীর কণ্ঠে মাকে ডেকে তিনি বলেন, "তোমার ছেলেকে আটকে রাখতে চেষ্টা কোরোনা মা, পারবে না। দেখলে তো এত সাবধানতার ভেতর থেকেও সে তোমায় ফাঁকি দিলে? ওকে যেতে দাও ওর নিজের পথে—দেখবে, একদিন ওরই গর্বে তোমার বুক ভরে উঠবে। তুমি যদি নিজে বল মা যে, তুমি ওকে ওর নিজের পথে যেতে দেবে তাহলেই ওকে আবার জীবিত ফিরে পাবে—নচেৎ নয়।"

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী অদৃশ্য হয়ে যান। সবাই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। এই এখনই দাঁড়িয়ে কথা বলছিল আর এই মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল! তবে কি এ দৈববাণী!

একটা বুকভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে মায়ের বুক থেকে, "তবে তাই হোক ঈশ্বর ; ওকে আমি ওর নিজের পথেই যেতে দেব। তুমি ওকে একবার আমার কাছে ফিরিয়ে দাও প্রভু!"

ওকি! ওকি! সকলে চমকে উঠে জলের দিকে তাকায়। কি অদ্ভুত! নদীর ওপর ভেসে ওঠে সেই অতিকায় কুমীরের মুখ। কুমীরটা ছেলেটিকে ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে আবার চলে যায় জলের তলায়। ছেলে জল থেকে উঠে আসে স্বচ্ছন্দে, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায়। মা ছুটে এসে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। তাঁর সাত রাজার ধন এক মাণিক!

অবশেষে আসে বিদায়ের দিন ; চোখের জলে বুক ভেসে যায় মার, তবু বার বার আঁচলে চোখ মুছে ফেলেন। যদি ছেলের অমঙ্গল হয়! ছেলে দেখে, মার চোখে জল! বলে—"কাঁদছ কেন মা? আবার আমি তোমার কাছে ফিরে আসব।"

ধীরে ধীরে পথপাগল ছেলে অদৃশ্য হয়ে যায় পথেরই বাঁকে। মা লুটিয়ে পড়েন পথের ধূলায় ; কানে ভেসে আসে টুকরো টুকরো কতগুলো কথা—"মা, আমি যাব।"

"কোথা যাবি রে?"

"হ্যাঁ মা আমার যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাব—আমি সন্ন্যাসী হব।"

সত্যিই চলে গেল শেষে!

এই পথপাগল ছেলেই একদিন হয়ে ওঠে মধ্যযুগের ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর ধর্মমত, তাঁর উপদেশ দেশের জনসাধারণের মনে এক অভাবনীয় সাড়া এনে দেয়—দলে দলে কাতারে কাতারে লোক ছুটে আসে এই মহাপুরুষের মুখের সামান্য একটা কথা শোনবার জন্য।

এই মহাপুরুষই ভারতের মাটিতে প্রথম প্রচার করেন 'অদ্বৈতবাদ'। এই অদ্বৈতবাদের মূল কথা হল, 'ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নেই।'

কিন্তু কেবলমাত্র ধর্মমত প্রচার ও দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যাই তাঁর জীবনের একমাত্র কীর্তি নয়। ভারতের কয়েকটি পুণ্যতীর্থে তিনি যে কয়টি মঠ প্রতিষ্ঠা করে যান তার মধ্যে পুরীর 'গোবর্ধন মঠ', দ্বারকার 'সারদা মঠ', বদরিকাশ্রমের 'যোশী মঠ' ও মহীশূরের 'শৃঙ্গেরী মঠ' তাঁর পুণ্য স্মৃতিকে অমর করে রেখেছে। এই মহাপুরুষ হলেন ভারত-গৌরব শঙ্করাচার্য।

কথার খেয়াল

—শ্রীননীগোপাল দে

দিল্লীর শাহ আকবর যবে আরোহি' সিংহাসনে,
অপূর্ব এক মিনার গড়িতে অভিলাষ হলো মনে।
এমনি উচ্চ হবে সে মিনার উঠিবে গগনপানে,
যাহা নাই কভু কোন ইতিহাসে, রচে নাই কোনখানে।
আদেশিল তাই পারিষদ-দলে, উচ্চ মিনার গড়,
যত লাগে টাকা, ইট, চূণ, কাঠ, ত্বরা আয়োজন কর।
চারিদিকে ওঠে মহাসমারোহ, হৈ হৈ, ধুমধাম,
মিনার গড়িতে জুটিল প্রচুর, বহুধা সরজাম।
সম্রাট্ সে যে, অভিলাষ তার, সফল হইল কালে,
উচ্চ মিনার শীর্ষ তুলিয়া উঠিল গগন ভালে।
সব কাজ শেষ, এল সংবাদ ; তাই পারিষদ সনে,
চলিলেন শাহ, গগনচুম্বী মিনারের দরশনে।
উচ্চ ও নীচ কর্মীর দল প্রভুরে জানায় নতি ;—
আগ্রহ ভরি মিনার হেরিছে আকবর মহামতি।
তৃপ্তি লভিয়া প্রধানে কহিল—"এমনি তো আমি চাই,
মিনার আমার, হয়েছে উচ্চ সন্দেহ কিছু নাই।"
প্রধান কর্মী যশের প্রভাবে উদ্দাম উৎসাহে,
খেয়ালের বশে বলিয়া ফেলিল আকবর বাদশাহে—
"মিনার আরও উচ্চ করিতে পারিতাম জাহাঁপনা!"
বাদশা কহিল—"কিসের অভাবে করিলে এ প্রতারণা ?
তোষামোদ তুমি শিখিয়াছ বটে, কাজেতে রহিল খুঁত,
করিতে পারিতে, করিলে না কেন ? কথা বটে অদ্ভুত!"

আনন্দ-উচ্ছল সুইট্‌জারল্যাণ্ড

—শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

জুরিক পরিক্রমা

পরের দিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই মনটা খুশীতে ভরে গেল নীল আকাশের কোলে রোদের প্রসন্ন হাসি দেখে। সঙ্গে সঙ্গেই স্মরণ হল, আজ আমরা সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্যতম শহর জুরিকে।

তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে পোশাক প'রে ঘরের মধ্যেই খেয়ে নিলাম ব্রেকফাস্ট।

একটু আগে আমাদের সেই ছাত্র বন্ধুটি এসে 'গুটেন মর্গেন' বলে জানিয়ে গেছে সুপ্রভাত। তার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপের মধ্য দিয়ে মোটামুটি একটা ধারণাও করে নিয়েছি জুরিকের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির সম্বন্ধে। তা' ছাড়া একটা সুখবরও জানা গেল তার কাছে। এই শহরেই নাকি আছে নিরামিষভোজীদের জন্য এক রেস্টুরেণ্ট—'ভেজিটেস্‌চের রেস্টুরেণ্ট' (Vegitescher Restaurant); সংক্ষেপে 'ভেজি'। এই মাংসাশীদের দেশে নিরামিষ রেস্টুরেণ্ট যেন মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যান। ঠিকানাটা মুখস্থ থাকবে না বুঝে বুকস্থই করে নিলাম, মানে নোটবুকে টুকে নিলাম,—Beicherweg 7.

এ দেশের যা রীতি তাই করলাম। ঘরের দরজা খুলে রেখেই বেরোতে হল বাইরে। কারণ প্রত্যহ সকালে 'মেড'রা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার প্রভৃতির সাহায্যে সমস্ত ঘরদোর পরিষ্কার করে, বিছানা পেতে, ময়লা তোয়ালের পরিবর্তে ধোপদস্ত তোয়ালে দিয়ে, ওয়াশ বেসিন পরিষ্কার করে ঝকঝকে তকতকে করে রাখবে ঘরগুলিকে। শুধু তাই নয়। কোথাও প্রতিদিন, কোথাও দু'একদিন অন্তর বিছানার চাদর প্রভৃতি পরিবর্তন করে দেওয়া রীতি। তাই ময়লা চাদর, বালিশের ওয়াড়, তোয়ালের কাঁড়ি সাবান দিয়ে কাচা ও ইস্ত্রি করা এদের দৈনন্দিন কাজ। তা' ছাড়া বোর্ডারদের ব্রেকফাস্ট পরিবেশন করা, এঁটো কাপ, ডিস্‌, প্লেট প্রভৃতি ধোয়া, জুতো বুরুষ করা এবং দরকার মত ছোটখাট ফাই ফরমাস তো আছেই! ছোট হোটেল বা পেঁসিওতে জুতো সেলাই থেকে বাইবেল পাঠ সব কাজই করতে হয় 'মেড'দের। এমন কি বাথরুম ও পায়খানা পরিষ্কারও করে তারাই। প্রয়োজন হলে হোটেল-কর্ত্রী স্বয়ং অথবা তাঁর কোন নিকটাত্মীয়া তাদের সাহায্য করেন এই সব কাজে। তোমরা ভুলে যেও না, এরা সবাই কিন্তু মেমসাহেব। কারণ সাহেব মেমেরই দেশ যে ওটা।

কিছুটা অবান্তর হলেও এত কথা একটু সবিস্তারেই তোমাদের বললাম। কারণ এটা তো আমার অজানা নয় যে এদেশে অনেকেরই ধারণা ওদেশের মেয়েরা সব পটের বিবি; খালি সেজেগুজে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা প্রজাপতির মতন ঘুরে বেড়ায়, কুটোটি নেড়ে সংসারের 'উবগার' করে না। কিন্তু এ ধারণা যে কত ভুল, সেটা বুঝেছি ওদেশের ইতর ভদ্র সর্বশ্রেণীর মেয়েদেরই কর্মনিষ্ঠা দেখে। আমাদের 'অমুকের মা', 'তমুকের মা' নাম্নী দাসীরা, যারা গতর খাটিয়ে খায় তাদের কথাই বল, আর গৃহস্থ-বধূদের কথাই বল, সকলেরই উচিত এ বিষয়ে ও দেশের মেয়েদের কাছে শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে শিক্ষাগ্রহণ করা।

একটি ইংরাজী প্রবচন আছে—Work is worship. কাজ করাই ভগবানের পূজা করা। এই আপ্তবাক্যটি ওরা মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে। কোন কাজই ওদের কাছে নীচ বলে গণ্য নয়। সেই জন্য কোন কাজ করাতেই লজ্জার কিছু নেই। বরং অকর্মণ্য লোকই ওদের বিবেচনায় ঘৃণার্হ।

আরও একটা কথা উল্লেখযোগ্য। হোটেলের ঘর খুলে রেখে বেরিয়ে গেছি তো কতদিনই। কিন্তু কেউ কোনদিন এতটুকু জিনিসও হাতসাফাই করেনি। অন্ততঃ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাই। এ কথাটা প্রায় অবিশ্বাস্য বলেই হয়ত তোমাদের মনে হবে। কিন্তু বিশ্বাস কর, কথাটা সত্যিই সত্যি। সেইজন্যই তো পরিহাসছলে আমি সুইট্জারল্যাণ্ডের নাম দিয়েছিলাম,—'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের দেশ'।

পেঁসিও থেকে বেরিয়ে অল্প একটু রাস্তা সোজা গিয়েই জুরিকের অন্যতম রাজপথ 'বানহফ স্ট্রাসে'। বানহফ স্ট্রাসে মানে 'স্টেশন রোড'। বড় বড় দোকান, নামজাদা হোটেল, রেস্টুরেণ্ট, কাফে, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অধিকাংশই পড়ে এই পথে। আর সে সব দোকানের সাজানো গেছানো শো-কেসের কি বাহার!

ফুলের দোকানের শো-কেসে কত রঙের কত রকমের ফুল কি সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। শো-কেসের গা বেয়ে জল পড়ছে ঝির ঝির করে, যাতে ফুলগুলি ঠাণ্ডায় তাজা থাকে সেই কারণে।

ফলের দোকানের শো-কেসে সাজিয়ে রেখেছে পীচ, প্লাম, কলা, আপেল, চেরি, বেরি প্রভৃতি ফল। পাশে ঘুরছে ইলেকট্রিক টেবিল ফ্যান। কেন বল তো? পাকা ফল থেকে জন্মায় এক রকম গ্যাস। কাঁচা বা আধপাকা ফলও তাড়াতাড়ি পেকে যায় সেই গ্যাসে। এঁচোড়ে পাকা হয় আর কি। ফলের সেই অকালপক্কতা রোধ করে ফ্যানের হাওয়া।

আর একটি পোশাকের দোকানের শো-কেসে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির বড় বড় চলন্ত পুতুল বিভিন্ন যুগের পোশাক প'রে এক পথে এসে ধীরে ধীরে আর এক পথে চলে যাচ্ছে দৃষ্টির অন্তরালে। পোশাকের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস রূপায়িত করার ছলে এইভাবে সমবেত দর্শকদের কাছে প্রচারিত হচ্ছে দোকানের বিজ্ঞাপন।

'হাণ্ডার' (Handar) নামে দোকানটির নাম আগেই শোনা ছিল। খুব নাম করা মস্ত দোকানের মধ্যে এও একটি। প্রবেশপথের মুখে কাচের দরজা কিন্তু বন্ধ। দরজা ঠেলে ঢুকতে হবে মনে করে এগিয়ে যেতে দরজা আপনিই খুলে গেল। আলিবাবার মত 'চিচিং ফাঁক'ও বলতে হল না। আবার ভেতরে ঢুকে যেতেই আপনিই গেল বন্ধ হোয়ে। অথচ দরজার ত্রিসীমানায় জনমানবের নামগন্ধ নেই। রূপকথার মায়াপুরী না কি? তোমরাও অনেকে হয়ত তাই ভাবছ? কিন্তু তা' নয়। আধুনিক জগতে বহু অসাধ্য সাধন করেছে যে বৈদ্যুতিক শক্তি, তাই আছে এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মূলে। আলপিন থেকে আরম্ভ করে আলমারি, আর পেঁটরা থেকে পোর্টম্যাণ্টো ছোট বড় যে কোন জিনিসই খোঁজ কর না কেন, প্রায় সবই আছে দোকানে। তা' ছাড়া আর এক বিশেষত্ব এই যে বিশেষ করে তোমাদের মতন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পছন্দসই জিনিসেই দোকানটি প্রায় ভর্তি।

বানহফ স্ট্রাসের এক প্রান্তে রেলস্টেশন, আর এক প্রান্তে জুরিক সি বা জুরিক হ্রদ। আমরা এসে পড়লাম সেই হ্রদের ধারে। কি মনোরম হ্রদ! হ্রদের কল-কল্লোলিত নীল জলে দুধের মত

ধবধবে সাদা হাঁস খেলা করছে, ছোট ছোট নৌকো ভাসছে, স্টিমার চলেছে যাত্রী নিয়ে। খেয়াঘাটে নানা রঙের নানা রকমের বোট,—মোটর বোট, প্যাড্‌ল্ বোট, স্পিড বোট। জল কেটে কেটে তীরবেগে চলে এই সব স্পিড বোট! মোটরেই চলে অবশ্য। প্যাড্‌ল্ বোট কোনটা লাল, কোনটা নীল, কোনটা বা অন্য রঙের। ধীরগতিতে চলে এরা। চলে মানে সাইক্লের মতন প্যাড্‌ল্

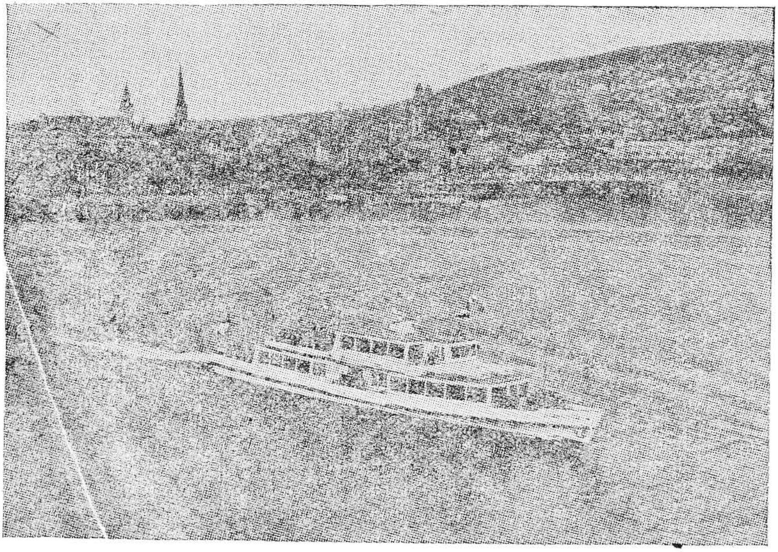

জুরিক হ্রদে স্টিমার চ'ড়েই স্থান কাল ভুলে গিয়ে মনের আনন্দে গেয়ে উঠলাম ঃ
"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের মত নাচেরে"

করে চালাতে হয়; স্টিমে বা পেট্রোলে চলে না। দু'জনে একত্রে চড়া চলে এসব বোটে। চড়ছেও নারী পুরুষ অনেকে। আজ মনে পড়ে ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া করে আমরাও প্যাড্‌ল্ বোটে কত প্রমোদ বিহার করেছি হ্রদের বুকে।

হ্রদ মানে ঠিক ঢাকুরিয়া লেক বা বেলেঘাটার লেক নয়। জুরিক হ্রদের দৈর্ঘ্য কত জান? প্রায় পঁচিশ মাইল। প্রস্থ গড়ে প্রায় আড়াই মাইল আর এটির গভীরতা প্রায় চার শ' সত্তর ফিট। এর দুই তীরের ক্রমোচ্চ পর্বতের গায়ে ছোট ছোট সুদৃশ্য বাড়িগুলি নির্মেঘ আকাশের নীচে গা মেলে যেন রোদ পোয়াচ্ছে। দূরের পটভূমিতে অভ্রভেদী আল্পস পর্বতশ্রেণী দৃষ্টিরোধ করে দাঁড়িয়ে। তার সিয়ারহর্ন, টোডি প্রভৃতি রৌদ্রোজ্জ্বল রজতশুভ্র তুষারশৃঙ্গগুলি যেন সুদূরের আহ্বান জানাচ্ছে।

নানা দেশ থেকে এসেছে ভ্রমণকারীর দল। কেউ ইটালি থেকে, কেউ ফ্রান্স থেকে, এমন কি ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা থেকেও। সংসারক্লিষ্ট মানুষের জীবনে যখন আসে ক্লান্তি, তখন সব দুঃখ, কষ্ট, ভয় ভাবনা পেছনে ফেলে বন্ধনমুক্ত বনহরিণের মত সে ছুটে বেরিয়ে পড়ে আনন্দের সন্ধানে। সেই

সব আনন্দ-সন্ধানীর এক বৃহদংশ এসে ভিড় করেছে সুইট্জারল্যাণ্ডে। তাই নৌকাবিহারী নরনারীর দাঁড়ের আঘাতে আলো-ঝলমল হ্রদের জল ছলছল করছে।

পরস্পরের মধ্যে পূর্বের কোন পরিচয় নেই, জাতি ধর্মেরও কোন খোঁজ নেই, অথচ রোইং বা দাঁড় টানার অথবা প্যাড্ল-বোট চালনার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

হ্রদের তীরে মাঝে মাঝে স্নানের ঘাট; সেখানে কাঠের তৈরী কেবিনের মধ্যে বেশ পরিবর্তন করে সাঁতারের পোশাক পরে নরনারী দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে হ্রদের জলে। পাল্লাপাল্লি চলেছে সাঁতারের। তাদের হাস্য পরিহাসে ও আনন্দধ্বনিতে 'মুখরিত দশ দিশি'। তাদের প্রাণের এই উল্লাস আর চঞ্চলতা দেখে মনে হয় দুর্ভাগ্যকে তারা ডরায় না, ভাগ্যবিপর্যয়ে তারা ভেঙ্গে পড়ে না। আমাদের কবির ভাষায় যেন তারা বলছে—'হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।'

লাঞ্চ খেতে হবে 'ভেজি'তে। ঠিকানা লেখা আছে বটে, কিন্তু পথের সন্ধান ঠিক জানা নেই। ঘুরতে ঘুরতে এলাম যে জায়গায় তার স্থানীয় নাম 'প্যারেড'। সেটা ট্রামের একটা টার্মিনাস। বিভিন্ন লাইনের ট্রাম এসে এখান থেকে ঘুরে চলে যাচ্ছে আবার ফিরতি পথে। সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি লোক; মাথার টুপিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কি সব লেখা। ইংরাজীতে লেখা আছে 'ইনফরমেশন' (Information)। তার সামনে বেশ বড় একটি ম্যাপ ঝুলছে। অনুসন্ধিৎসু ভ্রমণকারীদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে তাদের সাহায্য করাই তার কাজ। অনেকগুলি য়ুরোপীয় ভাষায় দখল আছে লোকটির। 'ভেজি'র সন্ধান ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করতেই সে সসম্ভ্রমে ও সবিনয়ে ম্যাপ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে কোন পথে কি ভাবে আমাদের যেতে হবে 'ভেজি'তে। তার বিনয়নম্র আচরণে যে ভাবটি প্রকাশ পেল তাতে মনে হয় তার এই সাহায্য গ্রহণ করে উপকৃত আমরা হলাম না; তাকে এই সাহায্য করার সুযোগ দান করায় সেই বেশী উপকৃত হয়েছে।

মিনিট দশেক পায়ে হেঁটে গিয়ে পেলাম 'ভেজি'। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে দেখি রেস্টুরেণ্ট সরগরম। অনেক সাহেব মেম খানা খাচ্ছে। পরিবেশন করছে মেমরাই। এ দেশের লোকরাও তা'হলে সত্যিই নিরামিষ পছন্দ করে ?

পরিবেষ্টা এসে মিষ্টি হেসে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করে একটি টেবিলে বসালে। টেবিলের ওপরেই ছিল একটি মেনুকার্ড। কি কি অপরূপ নিরামিষ ভোজ্য সেদিন রান্না হয়েছে দেখে নিলুম সেই কার্ডের খাদ্য-তালিকায়। দেখে তো অবাক! ভুল দেখছি নাকি ? চোখ রগড়ে আবার ভাল করে দেখলাম। না, ঠিকই তো দেখছি। নিরামিষ ভোজ্যের তালিকায় ডিম ? তা হলে মাছ মাংসও আছে নাকি ? না; আমাদের নিতান্ত সৌভাগ্য যে ও দুটো জিনিস ওদেশে এখনও নিরামিষের মর্যাদা লাভ করেনি। সেটা যেদিন করবে, সেই দিনই হবে সকল আপদের শান্তি। সারা গৌরাঙ্গের দেশটাই পুরোপুরি নিরামিষাশী হয়ে যাবে।

স্বল্প পরিমাণ ভাত, আলু, কড়াইশুঁটি আর ফ্রেঞ্চবিন সিদ্ধ, দু'রকম কারি আর একটা 'স্যালাড' অর্ডার দিলাম। পরিবেষ্টা মধুর হেসে মেনুকার্ডের একাংশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে—এ জিনিসটা আজকের স্পেশাল। ভারতীয়দের একটি মিটিং ছিল আজ এখানে। সেইজন্য তাঁদের পছন্দমত এই জিনিসটি রান্না হয়েছে। খেয়ে দেখুন, নিশ্চয় আপনাদের ভাল লাগবে।

বললাম,—তথাস্তু, নিয়ে এস ওটাও।

কিছুক্ষণ পরে খাবার দিয়ে গেল টেবিলে। দেখে নিলাম স্পেশালের চেহারাটা। যবের চেপ্টা বড়ার মতন কি যেন একটা জিনিস। আস্বাদ নিয়ে একেবারে বসে পড়লাম। মানে মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। মনে হল বাঙালী মেয়েদের হাতের রান্না যদি খেত এরা একবার তা হ'লে বাঙালী কবির ভাষায়ই বলতে হত—'ইচ্ছা করে ধন্না পাড়ি রান্নাঘরে ঢুকে'।

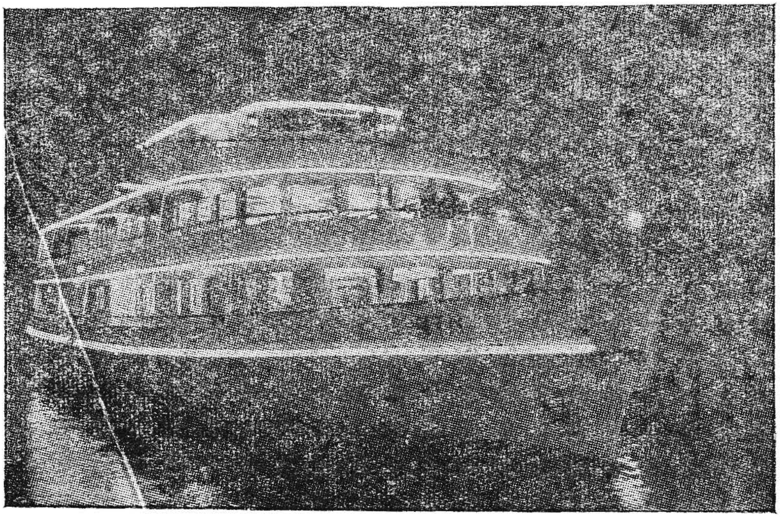

জুরিক হ্রদে সেলুন স্টিমারে বসে আবার আবৃত্তি করলাম:
যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই—
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডের রান্নার খুব সুখ্যাতি শুনেছিলাম। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এটা খুব জোরের সঙ্গে হলপ করেই বলব, আনাজপাতি সিদ্ধ করায় যে সিদ্ধহস্ত ওরা, সেটা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা চলে না। আর সেইটাই যদি হয় নিরামিষ রন্ধন বিচারের মাপকাঠি, তা হ'লে কোন ভোজন-বিলাসী যদি বলে যে ওরা নিরামিষ রন্ধনে অপটু, নিঃসন্দেহে তাকে বলা যায়, সে ঘোর মিথ্যাবাদী। তবে আমিষ রান্না যখন মুখে দিই নি, তখন ও সম্বন্ধে মূক থাকাই শ্রেয়ঃ।

জুরিক হ্রদ থেকে বেরিয়েছে লিম্মাট নদী। যেখান থেকে এই নদীটি বেরিয়েছে ঠিক সেইখানেই এক সেতু; নাম 'কোয়ে ব্রুকে' (Quaibrucke)। নদী এমন কিছু প্রশস্ত নয়। অনেকটা খালের মতই। কিন্তু এমন করে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে যে সেই অপ্রশস্ত স্রোতস্বিনীও দস্তুরমত দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। এইটুকুই ওদের বিশেষত্ব। সামান্যকে কি করে অসামান্যের, সাধারণকে কি করে অসাধারণের পর্যায়ে উন্নীত করা যায়, সে বিদ্যা ওদের আয়ত্তে।

জুরিক শহরকে দ্বিধাবিভক্ত করে কুলু কুলু রবে বয়ে চলেছে আঁকা-বাঁকা সর্পিল লিম্মাট নদী।

নদীর ওপর কিছু দূর দূর ব্যবধানে একাধিক সেতু। মাঝিরা বৈঠা বেয়ে নৌকো চালাচ্ছে তার তলা দিয়ে। নদীতটের অদূরে ছোট ছোট গলি ও বাড়িগুলি দেখলেই বুঝতে দেরী হয় না জুরিকের প্রাচীন পল্লী এটি।

নদীর উত্তর তীরে গ্রোস মুনস্টার চার্চ বা ক্যাথিড্রাল, দক্ষিণ তীরে ফ্রাউ মুনস্টার চার্চ ও সেণ্ট পিটার্স চার্চ। ফ্রাউ মুনস্টার চার্চটিই এখানকার প্রাচীনতম চার্চ। খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনীদের মঠ হিসাবে এর প্রথম প্রতিষ্ঠা প্রায় এগারশ' বছর আগে। জুরিক শহর পত্তনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঐ দুটি মুনস্টার চার্চের নাম। সেণ্ট পিটার্স চার্চের মাথায় যে ঘড়িটি আছে তার

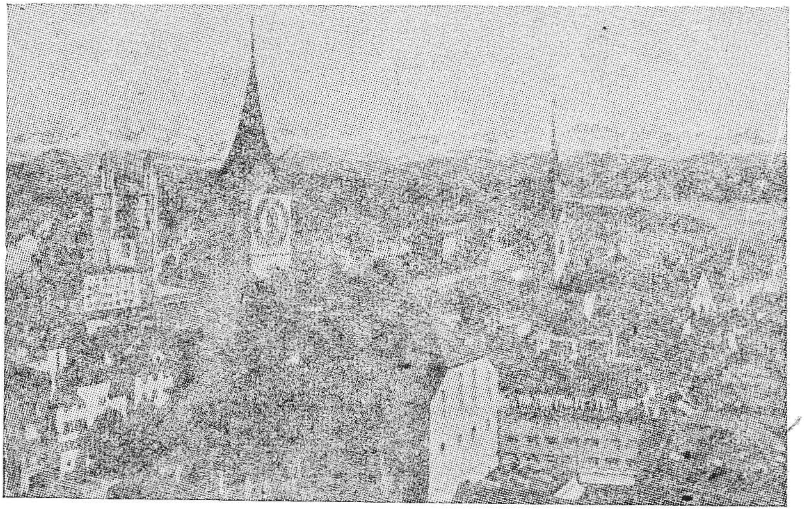

লিম্মাট নদীর তীরে গ্রোস মুনস্টার, সেণ্ট পিটার্স ও ফ্রাউ মুনস্টার চার্চ।
দূরের পটভূমিতে আল্পস্ পর্বতের তুষার-শৃঙ্গ।

সামনের আটাশ ফিট পাঁচ ইঞ্চি ব্যাসের গোল কাঁচটিও এখানকার দ্রষ্টব্য জিনিসের মধ্যে গণ্য। কারণ আজ পর্যন্ত সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে এত বড় 'ডায়াল' (Dial) আর কোন ঘড়ির নাকি নেই। নদীর উত্তর তীরে আরও আছে,—টাউনহল, জল গির্জা (Water church) এবং জুইঙ্গলির প্রতিমূর্তি। স্বনামধন্য ধর্মসংস্কারক 'জুইঙ্গলি' (Zwingli) গ্রোস মুনস্টার চার্চের পুরোহিত ছিলেন প্রায় দশ এগার বছর।

সেণ্ট পিটার্স চার্চের সন্নিকটে একটি মাঝারি শ্রেণীর হোটেল; নাম 'সামেন মাউসের' (Samen Mauser)। ফটকের পাশের একটি ফলকে হোটেল-কর্তা সগৌরবে ঘোষণা করেছেন ভিকটর হুগো, আলেকজান্দার ডুমা, ভল্টা, গ্যেটে প্রভৃতি মনীষীরা কখনও না কখনও এই হোটেলেই করেছিলেন অবস্থান। সত্যি গৌরব করবার মতই বটে!

লিম্মাট নদীর উত্তর তীর থেকে উঠেছে ক্রমোচ্চ পার্বত্যভূমি। সেই উচ্চ ভূমির ওপর থরে থরে ঘন-সন্নিবিষ্ট বাড়ি। তার মধ্যে বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়, সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি আর ক্যাণ্টনাল হাসপাতালের বাড়িগুলি।

সেণ্ট্রাল রেলস্টেশনের পেছনে লিম্মাট নদী ও শীর্ণস্রোতা 'সিল' (Sihl) নদীর সঙ্গম। সঙ্গমের অদূরে সিল নদীর এক পারে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের জাতীয় জাদুঘর (Swiss National Museum), অপর পারে ব্যবহারিক শিল্পের জাদুঘর (Museum of Applied arts)। জাতীয় জাদুঘরে দক্ষ শিল্পীদের আঁকা ছবি, চীনামাটির দ্রব্য, খোদিত মূর্তি, প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির মূল্যবান সংগ্রহ দেখলে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের শিল্প ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হয়। ব্যবহারিক শিল্পের জাদুঘরে আছে স্থাপত্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, হাতের কাজ প্রভৃতির বহু নিদর্শন।

আধুনিক জুরিক শহর গড়ে উঠেছে লিম্মাট নদী ও সিল নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে। শহরের প্রাণকেন্দ্র বানহফ স্ট্রাসে। ইলেকট্রিক ট্রামে চড়ে চললাম একদিন শহর দেখতে। ট্রামের রঙ ঘন নীল। সাধারণতঃ দু'খানি গাড়ি জোড়া থাকে। কিন্তু বেশী ভিড়ের সময় তার সঙ্গে আর একখানি জুড়ে দেয়।

পরিচ্ছন্নতম দেশ বলে য়ুরোপ-জোড়া খ্যাতি সুইট্‌জারল্যাণ্ডের। রাস্তায় নোংরা তো দূরের কথা কাগজের এতটুকু টুক্‌রোও বিরল। পিচ দেওয়া রাস্তা ঝকঝকে পরিষ্কার। ওদেশে ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ কেউই খেয়াল খুশীমত যত্রতত্র পুরোনো ট্রামের টিকিট, চকোলেটের মোড়ক, দেশলাই বা সিগারেটের খালি কৌটো অথবা ফলের খোসা প্রভৃতি রাস্তায় ফেলে রাস্তা অপরিষ্কার করে না; এসব ফেলার জন্য জায়গায় জায়গায় আছে 'লিটার বিন' (Litter Bin) বা জঞ্জাল ফেলার আধার, সেই বিনের মধ্যে ফেলে। ট্রাম বাসের মধ্যেও আছে এই রকম বিন, পুরাণো টিকিট ফেলার জন্য।

এই সম্পর্কে একটা কথা মনে পড়ল। কয়েক বছর আগে কলকাতায় 'পরিচ্ছন্ন কলকাতা'র (Cleaner Calcutta). আন্দোলন হয়েছিল। বউবাজার অঞ্চলের লাইটপোস্টগুলিতে অনেক লিটার বিন ফিট করে জনসাধারণকে অনুরোধ করা হয় তাঁরা যেন ছেঁড়া কাগজপত্র, ফলের খোসা প্রভৃতি ঐ বিনের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও না ফেলেন। এই অনুরোধ কি ভাবে পালিত হয়েছিল জান? বিনগুলিকেই ভেঙ্গে তুবড়ে অকেজো করে দিয়ে। লজ্জার কথা না?

একদিন গেলাম জুরিক বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে। ভুবনবিখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌ পেস্টালোজ্জির (Pestalozzi) জন্মভূমি জুরিক। শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে জুরিকের খ্যাতিও কম নয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে বহু ছাত্র আসে এখানে অধ্যয়ন করতে। প্রসিদ্ধ জার্মান বৈজ্ঞানিক ও গণিতবিদ প্রফেসর আলবার্ট আইনস্টাইন, যিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন, তাঁর নাম নিশ্চয় তোমাদের অজানা নয়। এই জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়েই এককালে তিনি অধ্যাপনা করতেন, আর সেই সঙ্গেই করতেন বিজ্ঞানের আরাধনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তীর্ণ হাতার মধ্যে ছড়িয়ে আছে প্রাণিবিদ্যার জাদুঘর (Zoological Museum), জাতিতত্ত্বের জাদুঘর (Ethnological Museum) প্রভৃতি নানা শাখা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনতিদূরে ফেডারেল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি, যার স্থানীয় নাম 'টেকনিশে হোখশুলে'। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ টেকনিক্যাল কলেজ এইটি। দেশবিদেশের অনেক ছাত্র এই ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রয়োগশালায় (Laboratory) হাতেকলমে কাজ শিখে শিল্প-বিজ্ঞানে

পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। জুরিক বিশ্ববিদ্যালয় আর ফেডারেল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি থেকে আজ পর্যন্ত নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তের জন।

ফেরার পথে এলাম সরকারী ক্যাণ্টন হাসপাতালের একেবারে গা ঘেঁসে। মাত্র বছর সাতেক আগে স্থাপিত হলেও চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামে সমৃদ্ধ বলে এই হাসপাতালটি য়ুরোপে এর মধ্যেই বেশ খ্যাতি লাভ করেছে।

জুরিকবার্গ চিড়িয়াখানা শহর থেকে বেশ দূরে। ট্রামেই গিয়েছিলাম একদিন। নামলাম একেবারে টার্মিনাসে। সংখ্যায়ই বল আর বৈচিত্র্যের দিক দিয়েই বল, পশুপক্ষী আলিপুর চিড়িয়াখানার চেয়ে যে কম, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। তবে তাদের স্বাভাবিক আবেষ্টনের মধ্যে রাখার রীতি সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। ভারতবর্ষের জন্তুর মধ্যে এক ব্রাহ্মণী গাই ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ল না।

ফিরতিপথে নামলাম 'ডলডার' (Dolder) পর্বতের পাদদেশে। পর্বতের ওপর রমণীয় পরিবেশে বিস্তীর্ণ উদ্যানের মধ্যে স্থানীয় অন্যতম হোটেল 'ডলডার গ্র্যাণ্ড হোটেল'। আরও আছে রেস্টুরেণ্ট, গল্‌ফ্‌ ও টেনিস খেলার লন, কৃত্রিম স্কেটিং রিঙ্ক প্রভৃতি। এখান থেকে অনেক নীচের জুরিক শহর ও হ্রদ ছবির মতন দেখায়। কিন্তু এখানে সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য উন্মুক্ত আকাশের নীচে কৃত্রিম 'বেদিং পুল'। পুলের চোখ জুড়ানো ঘন নীল জলে কি ঢেউ ভাঙছে! স্নানার্থী নারী পুরুষ কেউ স্থির থাকতে পারছে না সেই তরঙ্গাঘাতে। তোমরা হয়ত ভাবছ তরঙ্গ আবার এল কোথা থেকে? সত্যিই আশ্চর্য হবার কথা, কারণ সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ত্রিসীমানায় সমুদ্রের 'স'ও নেই কোনখানে। সেই কারণেই তো ওরা দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর মতন যন্ত্রকৌশলে তরঙ্গ সৃষ্টি করে বেদিং পুলেই সমুদ্রস্নানের সাধ মেটাচ্ছে। কোন সাধ অপূর্ণ রাখা ওদের কোষ্ঠীতে লেখেনি।

আমাদের দেশে স্থায়ী জাদুঘর বা প্রদর্শনী শহরে সাধারণতঃ একটিই থাকে। জুরিকে কিন্তু আছে চার-পাঁচটি। জাতীয় জাদুঘর ও ব্যবহারিক শিল্পের জাদুঘরের কথা আগেই বলেছি। আর একটি আছে,—'রিয়েতবার্গ আর্ট ম্যুজিয়ম' (Rietberg Art Museum), শহর থেকে কিছুটা দূরে বিস্তীর্ণ এক পার্কের মধ্যে। য়ুরোপীয় আর্টের কোন পরিচয় কিন্তু নেই এখানে। প্রদর্শনী-কক্ষটি সাজানো হয়েছে ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, ভূমধ্য অঞ্চল, আফ্রিকা, আদিম আমেরিকা প্রভৃতি স্থান থেকে সংগৃহীত চিত্র, প্রতিমূর্তি প্রভৃতি দিয়ে।

এগুলি ছাড়াও 'কুন্সটহাউস' (Kunsthaus) বা চিত্রভবনে আছে দেশবিদেশের চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শন।

জুরিকে গীতবাদ্য অভিনয়াদির চর্চাও যে যথেষ্ট আছে তা বোঝা যায় প্লে হাউস, মিউনিসিপ্যাল থিয়েটার, বার্ণহার্ড থিয়েটার, কর্সো থিয়েটার প্রভৃতি একাধিক রঙ্গালয়ের অস্তিত্ব দেখে। কংগ্রেস বিলডিং সংলগ্ন 'টোনহালে' বা সংগীতগৃহ পাশ্চাত্ত্যের সংগীত রসিকদের সুপরিচিত।

একদিন দুপুরে হ্রদের তীরবর্তী পার্কের বেঞ্চে বসে বিশ্রাম করছি; দেখলাম স্টিমার ঘাটায় সেলুন স্টিমার লেগেছে যাত্রী তোলার জন্য। সখ হল স্টিমার বিহারের। তাড়াতাড়ি জেটিতে গিয়ে

টিকিট কিনে স্টিমারের সামনের দিকে উন্মুক্ত স্থানে একটি বেঞ্চে দু'জনে বসলাম। সহযাত্রীদের সকলের মুখেই হাসি, সকলের চোখেই আনন্দের দীপ্তি।

হ্রদের দুই তীরেই কিছু দূর পর্যন্ত পদচারণের জন্য চমৎকার প্রশস্ত ভ্রমণপথ আর পার্ক। মাঝে মাঝে বেঞ্চ। সেই বেঞ্চে বসে অনেকে রৌদ্রসেবন করছে। ছায়াস্নিগ্ধ স্থান যাদের পছন্দ, তারা বসেছে গাছের তলায়। উত্তর তীরের ধার-ঘেঁষা 'জুরিকহর্ণ' (Zurichhorn) পর্যন্ত এক মাইল প্রসারিত ঐ পথ দিয়েই তো সেদিন বেড়িয়েছি আমরা। ঐ দেখা যায় যত স্নানের ঘাট,—'উটো কোয়ে', 'সিফেল্ড কোয়ে'! বিপরীত তীরে 'আল্পেন কোয়ে', 'মাইথেন কোয়ে'। মাইথেন পার্কে সিংহমূর্তির সন্নিকটে যে বেঞ্চটিতে ক'জন ছেলেমেয়ে বসে আমাদের চলন্ত স্টিমারের দিকে হাসিমুখে চেয়ে হাতছানি দিচ্ছে, ঐ বেঞ্চেই আমরা বসেছিলাম সেদিন।

হ্রদের উভয় তীরে ছোট ছোট নিভৃত গ্রাম,—হর্গেন, মিলেন, ওয়াডেন্সউইল, স্টাফা···। সেই সব গ্রামে ভিড়ছে আমাদের স্টিমার, একবার এ তীরে একবার ও তীরে। যাত্রীরা কেউ ধীর সুশৃঙ্খল-ভাবে নেমে যাচ্ছে সেই সব গ্রামে, কেউ বা সেখান থেকে এসে উঠছে স্টিমারে। দুগ্ধপোষ্য একটি নধর শিশু পেরাম্বুলেটারে শুয়ে আপন মনে খেলা করছিল, তার মা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে স্টিমারে উঠে এলেন। স্টিমারের মধ্যেই রেস্টুরেণ্ট। তোমাদের মত ছোট ছোট একদল ছেলেমেয়েও বেড়াতে যাচ্ছে তাদের শিক্ষকের সঙ্গে। রেস্টুরেণ্ট থেকে বিস্কুট ও চকোলেট কিনে খাচ্ছে তারা।

পর্বতের ঢালু গায়ে ছোট ছোট বাড়ি। সত্যিই মনে হয়, 'ছায়াসুনিবিড়, শান্তির নীড়'। কিন্তু কেবল বাসগৃহ নয়। মাঝে মাঝে কোথাও তৃণশ্যামল গোচারণভূমি, কোথাও বাগানবাড়ি আবার কোথাও খাস খামারের মধ্যে জমিদারগৃহ।

আমাদের গন্তব্যস্থান হ্রদের প্রায় শেষ প্রান্তে। ছোট শহরটির নাম 'র‍্যাপারসউইল' (Rapperswil)। প্রায় দু'ঘণ্টা লাগল পৌঁছতে।

স্টিমার এখানে খালি হয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক ঘুরলাম এধার ওধার। স্টিমার-ঘাটের নিকটেই এক প্রাচীন প্রাসাদ (castle)। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্থানীয় ইতিহাসের অনেক কথা। বর্তমানকালে কিন্তু এটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে যাদুঘর হিসাবে।

হ্রদের ওপর দিয়ে কাঠের একটি দীর্ঘ সেতু। অনেক লোক বিশুদ্ধ বায়ু-সেবনের জন্য পদচারণা করছে সেতুর ওপর। দূরে তুষারমৌলি আল্পসের অবারিত দৃশ্য।

ফিরতি স্টিমারে চললাম আবার জুরিক।

দিনান্তের অস্তরবি ধীরে ধীরে ডুবে গেল পাহাড়ের অন্তরালে। নিবিড় হয়ে উঠল গোধূলির ছায়া। অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্বতের গায়ে ঘেঁসাঘেঁসি বাড়িগুলিতে শুরু হয় আলোর রোশনাই।

জুরিক যখন পৌঁছলাম, আলোকিত নগরীর কম্পমান প্রতিবিম্ব বুকে ধরে হ্রদের জলে তখন উঠছে শিহরণ।

ভাগ্যফল

—শ্রীদৃষ্টিহীন

রেলের চাকরী করি। তাই কোথাও বেশি দিন স্থায়ী হতে পারি না। এক জায়গায় দু'বছর কাটতে না কাটতেই ওপর থেকে হুকুম আসে, অন্য জায়গায় যেতে হবে।

সেবারে একটা ছোট স্টেশন থেকে বদলী হয়ে গেলাম একটি বড় স্টেশনে। ঘর দোর গুছিয়ে নেবার পালা শেষ হয়ে গেলে বের হোলাম স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে আলাপ করতে। দোকান, বাজার ও নানা রাস্তাঘাট ঘুরে একদিন সন্ধ্যায় সময় এসে পড়লাম একটি বড় বাংলোর সামনে। বাংলোটার ভেতর থেকে ভেসে আসছে পিয়ানোর টুং টাং আওয়াজ। সামনে বাগানের মধ্যে একটি চার পাঁচ বছরের ছোট ছেলেকে ব্যাটবল হাতে চাকরের সঙ্গে খেলতেও দেখলাম। বাড়ির বাইরে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে যে পাহারা দিচ্ছিল তার পোশাকের দিকে চোখ পড়তেই বুঝতে পারলাম বাড়িটা কোনও পদস্থ সরকারী কর্মচারীর হবে। হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠি মোটরের একটা তীব্র হর্ণ শুনে। তাড়াতাড়ি সরতে গিয়ে গেটের সামনের দিকে গিয়ে পড়লাম। ব্রেক কষে ততক্ষণে ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে ফেলেছে। আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে পেছনে বসা গাড়ির আরোহীর ওপরে।

চমকে উঠলাম আরোহীকে দেখে। আমাদের গ্রামের রথীন না? ভাল করে দেখবার জন্য সেখান থেকে চলে না গিয়ে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম সে-দিকে। ততক্ষণে গেটের কাছে দরোয়ান ছুটে এসেছে। হিন্দীতে আমাকে যা বলে তার অর্থ—"বাবু কি করছেন, দেখছেন না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের গাড়ি আটকে রয়েছে। আর্জি যদি কিছু থাকে ত' পরে জানাবেন, এখন গেটের সামনে থেকে সরে দাঁড়ান। সাহেব এখন কোর্ট থেকে ফিরছেন।"

আমি তাড়াতাড়ি এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। সাহেবী পোশাক-পরা আরোহীর দৃষ্টি বোধ হয় ততক্ষণে আমার ওপর পড়েছিল। গাড়ির দরজা খুলে সে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে এবং আমায় লক্ষ্য করে এগিয়ে আসে। মুখের ওপর উজ্জ্বল বিজলী-বাতি পড়ায় পরিষ্কার চিনতে পারলাম তাকে। হ্যাঁ এ আমাদের রথীনই বটে। আনন্দে এগিয়ে গেলাম তার কাছে। সাময়িকভাবে ভুলে গেলাম আমার ময়লা জামা-কাপড়ের কথা। তার দিকে দু'পা এগিয়ে যেতেই, সে বলে—"অমল না? তোমায় যে চিনতেই পারা যায় না! মাথায় যা এক বিরাট টাক গজিয়েছ। দেখতেও অনেকটা বুড়ো হয়ে গেছ।"

আমি রথীনের কাছ থেকে এতটা আন্তরিক ব্যবহার আশা করিনি। ভেবেছিলাম, বোধ হয় আমাকে চিনেও, না চেনার ভান করবে। একে বড়লোকের ছেলে, তার ওপর জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আর আমি রেলওয়ের সামান্য অ্যাসিস্টাণ্ট স্টেশনমাস্টার। ওর সঙ্গে, আমার কোনও তুলনাই হয় না। তবে কেবল দাঁড়িয়ে পড়েছি অতীত দিনের বন্ধুত্ব স্মরণ করে। গ্রামের স্কুলে ওতে আমাতে দশটা বছর কাটিয়েছি। কলেজেও একসঙ্গে দু'বছর পড়েছিলাম। আমি আই. এ. পাশ করে সংসারের চাপে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ঢুকলাম রেলে। আর ও লেখাপড়া চালিয়ে এম. এ. পাশ করে গেল বিলেত। সেখান থেকে আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাশ করে ফিরে এলো। গ্রামে একবার গিয়ে এ খবরটা শুনেছিলাম। কিন্তু এই দীর্ঘ ষোল সতের বছরের মধ্যে আর পরস্পর দেখাশুনা হয়নি।

কি উত্তর দেব তাই ভাবছি। এমনি সময় খপ করে আমার ডান হাতটা রথীন ধরে ফেল্লো। তারপরে বল্লো—"ভ্যাবা গঙ্গারামের মত কি ভাবছিস, ভেতরে চল্।" আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মত এক পা এক পা করে তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলাম। বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই বাগানে ক্রীড়ারত সেই চার পাঁচ বছরের ছেলেটি বাবা বলে ছুটে এসে রথীনকে জড়িয়ে ধরতে গেল। কিন্তু সঙ্গে আমাকে দেখে কেমন থতমত খেয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল। অপ্রস্তুত হবার কারণটা বুঝতে পেরে রথীন দু'হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। তারপর তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে বল্লো—"লজ্জা কি অশোক! উনি যে তোমার কাকাবাবু হন।"

একটা ড্রয়িংরুমে আমাকে বসিয়ে রথীন বল্লে—"অশোক তুমি তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে গল্প কর। আমি বাইরের জামাকাপড়গুলো ছেড়ে আসি।" তারপর আমার দিকে চেয়ে বলে—"অমল তুই একটু বোস ভাই, আমি এলুম বলে।" রথীন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর অশোকের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করলাম। ভাব জমেও উঠলো। খানিকক্ষণ বাদে রথীন সেই ঘরে এসে ঢুকলো। তারপর আমাদের নানা গল্প শুরু হল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রথীন আমার কাছে প্রায় সব পুরানো বন্ধুর খবর জানতে চাইলো। দেখলাম সে কাউকেই ভোলেনি। ইতিমধ্যে বেয়ারার সঙ্গে রথীনের স্ত্রী এসে টেবিলের ওপর আমাদের জল-খাবার দিয়ে গেলেন। খেতে খেতেও গল্প চলে, তা যেন আর ফুরাতেও চায় না। সে-রাত্রে রথীন আর তার স্ত্রী কিছুতেই আমাকে না খাইয়ে ছাড়লে না। আহারাদি শেষ করে যখন আবার রাস্তায় বেরিয়ে এলাম ঘড়িতে তখন রাত দশটা বেজে গেছে। যে বেয়ারাটা আমাকে গেট ছেড়ে সরে দাঁড়াতে বলেছিল, আমি মনিবের বন্ধু বলে এবার সে-ই আমাকে সেলাম জানালো। রাস্তায় বেরিয়ে কেবলই একটা কথা মনে হতে লাগলো—রথীন

কতো সুখে আছে! তার কি ভাগ্য, ভগবানের আশীর্বাদ ঝড়ে পড়েছে ওর মাথায়। বাঁচতে যদি হয় তো ওর মতনই বাঁচা ভাল। সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের দারিদ্র্যের কথা মনে পড়ে যায়। সামান্য মাহিনা, প্যাসেঞ্জারের চোখ রাঙানি, ওপরওয়ালার কথায় কথায় কলমের খোঁচা। অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আমি যেন ক্ষত-বিক্ষত।

রাস্তায় বেরিয়ে কেবলই মনে হতে লাগলো··· [পৃঃ ৪১৭

পুরানো বন্ধুত্ব আমাদের আবার জেগে ওঠে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমার পরম বন্ধু, কথাটা মুখে মুখে সমস্ত সহরেই ছড়িয়ে পড়লো। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করাবার জন্যে বহু লোক আমার রেলওয়ের ভাঙ্গা কোয়ার্টারে হানা দিতে শুরু করলো। মনে মনে আমি বেশ আনন্দ ও গর্ব অনুভব করলাম।

রথীনকে মাঝে মাঝে জরুরী কাজে যেতে হয় সহরের বাইরে। তখন তার স্ত্রী-পুত্রের ভার এসে পড়ে আমার ওপর। এই ভাবে ঘনিষ্ঠতা ক্রমে বেড়েই চললো।

সেবারে আমাদের সহরে 'টাইফয়েড' মহামারীরূপে দেখা দিল। টাইফয়েডের কবলে পড়ে অনেকেই অকালে জীবন হারালো। রথীন সহরের অবস্থা সমস্ত জানিয়ে সরকারের স্বাস্থ্য-দপ্তরের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালে। কিন্তু সরকারের সবকিছু নিয়মতন্ত্রের মধ্যে বাঁধা। তাই এ ক্ষেত্রেও দেখা গেল সাহায্য যখন এসে পৌঁছলো তখন অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

সে সময়ে টাইফয়েড রোগের এখনকার মত ভাল ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। যাকে একবার এ রোগে আক্রমণ করতো তাকে দু' মাসের আগে বিছানা থেকে

উঠতে দিত না। অনেক সময় রোগী এই রোগে, প্রাণে বাঁচলেও বিকলাঙ্গ হয়ে যেত।

এই রকম যখন সহরের অবস্থা তখন একদিন হঠাৎ রথীনের স্ত্রী এই রোগে আক্রান্ত হলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী, তাই চিকিৎসা বা সেবা-যত্নের কোনও ত্রুটিই হোলো না। কিন্তু গোল বাধলো ওষুধ নিয়ে। পশ্চিমে তখন যুদ্ধ লেগেছে, তাই ওষুধ আর খুব বেশী এদেশে আসতো না। যেটুকুও আসতো তার অধিকাংশই সরকার তুলে রাখতেন সৈন্য-বিভাগের জন্যে। কিছু অংশ বিলি করা হতো জনসাধারণকে। কিন্তু সেই অংশের সবটাই চলে যেত কলকাতার কালোবাজারে। তাই এই রকম ছোট্ট সহরে ওষুধ একরকম পাওয়াই যেত না।

রথীনের স্ত্রীর প্রায় দু'মাস বাদে জ্বর ছাড়লো, কিন্তু তিনি আর প্রকৃতিস্থ রইলেন না। সময় সময় অশোককেও নিজের ছেলে বলে চিনতে পারতেন না।

এই দুটো মাস অশোক কেবল তার আয়ার কাছেই কাটিয়েছে। ওদের বাড়িতে গিয়ে অনেক সময় লক্ষ্য করেছি অশোক তার মায়ের ঘরের দিকে বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে আছে। ডাক্তার আর নার্সের গণ্ডী পার হয়ে তার মার কাছে যাবার সাহসটুকু সে হারিয়ে ফেলেছে। তাকে কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছি—"অশোক মা'র জন্যে মন কেমন করছে বাবা ?"

সে কি যেন উত্তর দিতে গেছে—কিন্তু বলতে পারেনি। কথার পরিবর্তে তার দু'গাল বেয়ে ঝরে পড়েছে শ্রাবণের ধারার মতন অশ্রু। অনেকক্ষণ সান্ত্বনা দেবার পর সে আমায় জিজ্ঞাসা করেছে—"কাকাবাবু, মা কবে ভাল হবে ? তার জন্যে বড্ড মন কেমন করছে আমার।" তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছি—"হবেন বাবা, তিনি খুব শীগ্‌গির ভাল হয়ে উঠে তোমায় আবার কোলে নেবেন।"

স্ত্রীর অসুখের জন্য রথীন প্রথমটা ছুটি নিয়েছিল। দেখতে দেখতে ছুটি তার শেষ হয়ে গেল। তাই নার্সের ওপর স্ত্রীর সমস্ত ভার দিয়ে রথীন কাজে যোগ দেয়। একদিন দুপুর বেলায় নার্স ঘরে ছিল না। অশোক গিয়ে দাঁড়ালো তার মায়ের বিছানার কাছে। বড় বড় চোখ দুটো তুলে ধরে সে তার মায়ের দিকে। অভিমানে তার মন ভরে গেল। কতদিন পরে সে মায়ের কাছে এসেছে তবু মা তো তাকে ডেকে বিছানায় তুলে নিচ্ছেন না। অশোক কিছুতেই তাঁর সঙ্গে কথা বলবে না। সে স্থির হয়ে বিছানা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎ এমনি সময় তার মা নমিতা দেবীর দৃষ্টি পড়লো তার দিকে। নিজের ছেলে অশোককে তিনি চিনতে পারলেন না। কর্কশ কণ্ঠে বল্লেন—"কে রে বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে, যা এখান থেকে বেরিয়ে।"

অশোক স্থাণুর মতন সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎ কি ভেবে নমিতা দেবী আচমকা অশোককে দিলেন একটা ঠেলা। 'মাগো' শব্দ করে অশোক পড়ে গেল মাটিতে।

বিছানার কাছেই ছিল ওষুধপত্র রাখবার একটা ছোট্ট টেবিল। তারই কোণটাতে লেগে অশোকের মাথার ঠিক মাঝখানটা অনেকখানি কেটে গেলো। নার্স কাছেই কোথাও ছিল, শব্দ শুনে ছুটে এলো। ততক্ষণে নমিতা দেবী খাটের ওপর উঠে বসেছেন। রক্তাক্ত অশোকের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন। আর অশোক? সে তখন মাথার আঘাতে জ্ঞান হারিয়েছে। নার্স তাড়াতাড়ি মাটি থেকে জ্ঞানহীন অশোকের দেহটা তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। রথীনের ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে সে চলে গেলো সরকারী হাসপাতালে। নমিতা দেবী, নার্সের পেছন পেছন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন গাড়ির দিকে।

একজন লোক তখনই বেরিয়ে গেল রথীনকে আর আমাকে খবর দিতে। 'আপ' গাড়িটাকে পাস করিয়ে দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলুম। একটা টাঙ্গায় চড়ে সোজা চললুম হাসপাতালের দিকে।

হাসপাতালের চিল্ড্রেন ওয়ার্ডের সামনে দেখি রথীন গম্ভীরমুখে পায়চারী করছে।

টাঙ্গা থেকে নেমে আমি জিজ্ঞেস করলাম—"এখন কেমন আছে অশোক?"

রথীন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে—"আর থাকা থাকি! বাঁচবার আশা কিছুই নেই। নরম মাথা, একেবারে ব্রেনের ওপর আঘাত লেগেছে। যদি বাঁচে সেটা হচ্ছে ভগবানের দয়া।"

অশোকের জ্ঞান আর ফিরে আসে না। সেই দিনই ভোর রাত্রে তার মৃত্যু হয়। ডাক্তার যখন এসে আমাকে খবরটা দিলেন তখন রথীনের চোখে এক ফোঁটাও জল দেখিনি। কেবল আমাকে উদ্দেশ্য করে সে বল্লে—"অমল, চল্ যাই ওর শেষ কাজ করে আসি।"

আমি বলি, "বাড়িতে একবার যাবি না?"

বোধহয় চোখের জলটা গোপন করতেই রথীন মুখটা অন্যদিকে ফেরায়। তারপর নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলে—"কার কাছে আর ওকে নিয়ে যাব? ওর মা হয়তো ওকে চিনতেই পারবে না। তার চেয়ে না যাওয়াই ভাল।"

শ্মশান থেকে অশোকের শেষ কাজ করে যখন আমরা ফিরে এলাম তখন বেশ

বেলা হয়ে গেছে। আমি গেটের সামনে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে আমার কোয়ার্টারে ফিরে যেতে চাইলাম। কিন্তু রথীন আমায় ছাড়লো না। আসল কারণটা হয়তো ও বুঝতে পেরেছিল। আস্তে আস্তে আমার কাঁধে হাতটা রেখে বল্লো—"বাপ হয়ে আমি যদি বাড়ির মধ্যে ঢুকতে পারি, তুই কেন পারবি না?"

এর ওপর আর কথা চলে না।

আমি ওর সঙ্গে গিয়ে ড্রইংরুমে বসলাম। দু'জনেই চুপ চাপ।

বেয়ারাকে ডেকে রথীন চা আনতে বলে। ট্রেতে চায়ের পট সাজিয়ে বেয়ারা ঘরে ঢোকে।

টেবিলের ওপর চায়ের কাপ রেখে সে চলে যায় নিজের কাজে। সারা রাত জাগরণের পর সবেমাত্র কাপে আমরা মুখ দিয়েছি ঠিক এমনি সময়ে সে-ঘরে এসে ঢোকেন নমিতা দেবী। চোখের দৃষ্টি তাঁর উদাস। যেন কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। দেওয়ালের ওপর টাঙানো অশোকের একটা ছবির দিকে চেয়ে তিনি রথীনকে প্রশ্ন করেন—"আমার খোকা কোথায়, খোকা?" দেখলাম রথীনের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো। চা ভর্তি পেয়ালাটা শিথিল হাত থেকে মেঝের ওপর পড়ে গিয়ে খান খান হয়ে গেল। কোনও উত্তরই সে দিতে পারলো না। নমিতা দেবী আবার বল্লেন—"তোমরা আমার খোকাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ? বল; চুপ করে থেক না।"

আমি আর এ দৃশ্য দেখতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে পেছনের দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম 'লনের' মধ্যে। তারপর তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করি গেটের উদ্দেশ্যে।

চলতে চলতে শুনতে পেলাম ঘরের ভেতর কি যেন একটা মেঝের ওপর আছড়ে পড়লো। তার পরমুহূর্তেই শুনতে পেলাম নমিতা দেবীর বুকফাটা কান্না—"খোকারে, আমার খোকারে!"

এর পরের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। রথীন চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যায় নিজের গ্রামের বাড়িতে। আর আমি? ওপরওয়ালাকে সেই দিনই দরখাস্ত করি বদলীর জন্যে। আজও রথীনের কথা মনে পড়লে মাঝে মাঝে মনে হয় ভগবান রথীনকে যতখানি সুখ দিয়েছিলেন তার চেয়েও বেশী বোধ হয় দিয়েছিলেন দুঃখ। অতখানি দুঃখ ভোগ রথীনের জীবনে ছিল বলেই প্রথম জীবনে বোধ হয় সুখের ঔজ্জ্বল্য আমার চোখকেও ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। আজ মনে হয় সে কতখানি দুঃখী!

তুষারমানব রহস্য

—ডাঃ শ্রীধর সেনাপতি

পৃথিবীর নানাজাতির পর্বতারোহীর দল হিমালয় অভিযানে বেরিয়ে সেখানকার তুষারের ওপরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পায়ের ছাপ দেখে এসেছেন, যা' নাকি মানুষের পায়ের মতই দেখতে। যার পায়ের ছাপ দেখে অভিযাত্রীরা বিস্মিত ও শঙ্কিত—সে জীবটি কিন্তু আজ পর্যন্ত মানুষের অলক্ষ্যে হিমালয়ের নির্জন তুষারক্ষেত্রেই বিচরণ করছে। তাদের কেউ কেউ বলেন—'তুষারমানব'; কেউ বা বলেন—'ইয়েতি'।

সেণ্ট লরেন্স উপসাগরে গ্রাইণ্ডস্টোন দ্বীপ। আজ থেকে প্রায় ছিয়াশী বছর আগে অর্থাৎ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর, রবিবার, এক প্রচণ্ড ভয়াবহ তুষার-ঝড় শুরু হল সেই গ্রাইণ্ডস্টোন দ্বীপটিকে ঘিরে। তিন দিন তিন রাত দ্বীপের একটি প্রাণীও আশ্রয় ছেড়ে বাইরে বেরুতে পারল না। চতুর্থ দিনে ঝড়ের তীব্রতা কিছুটা কমল বটে, কিন্তু তবুও ঘরের মানুষ বাইরে বেরিয়ে প্রকৃতির সেই নির্মম লীলা দেখবার মত সাহস সংগ্রহ করতে পারল না! কয়েকটি দুরন্ত ছেলের যেন দম বন্ধ হয়ে যেতে লাগল বন্ধ ঘরের মধ্যে বসে বসে। বাইরে বেরোবার জন্য ছট্‌ফট্ করতে লাগল তারা। ঝড়ের তীব্রতা কিছুটা কমতেই তারা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ল। তুষারঝড় অগ্রাহ্য করে দৌড়তে দৌড়তে তারা একেবারে সমুদ্রের উপকূলে গিয়ে হাজির।

একটা ভাঙা জাহাজ তখন এসে ঠেকেছে সেইখানে। জাহাজের ভাঙা টুকরো কাঠ জলে ভাসছে। ছোট বড় নানা আকারের বাক্স ছড়িয়ে পড়ে আছে এখানে ওখানে। দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল ছেলের দলটি। এ সমস্ত জিনিসের মালিক এখন তারা। একটি লোকেরও অস্তিত্ব তাদের নজরে পড়ল না, যে নাকি এ-সবের মালিকানা দাবী করতে পারে।

এমন সময়ে হঠাৎ ছেলের দল ভয়ার্ত চীৎকার করে উঠল। প্রায় একই সঙ্গে তারা সবাই দেখল—এক বিরাটাকার তুষার ঢাকা মূর্তি ঝড়ের ভেতর দিয়ে টলতে

টলতে থপ্ থপ্ করে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। একটা অমানুষিক গোঙানির শব্দও যেন বেরিয়ে আসছে সেই মূর্তির গলা থেকে।

ভয়ে প্রাণপণে ছেলেরা নিজেদের বাড়ির দিকে ছুটল।

একটা হৈ চৈ পড়ে গেল গ্রাইণ্ডস্টোন দ্বীপে। ঝড়ে সমুদ্রে একটা জাহাজডুবি হয়েছে। সেটির দামী দামী মালপত্র সমুদ্রের জলে ভেসে এসে লেগেছে উপকূলে। ছেলেদের কাছ থেকে খবরটা পেয়ে কিছু-না-কিছু লাভের আশা সকলের মনেই জাগল। কিন্তু ছেলেরা যখন একথাও বলল যে, দৈত্যের মত বিরাটকায় তুষারঢাকা এক মূর্তিকে সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেখে ভয়ে তারা পালিয়ে এসেছে, তখন তাদের মনেও ভয় জাগল! কৌতূহলও জাগল কারুর মনে। কী সেটা! মানুষ, না দৈত্য? না ছেলেদের কল্পনাপ্রসূত কোন ভয়ংকর জীব?

কিন্তু তুষারঝড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জাহাজের ভেসে আসা মালের লোভে দ্বীপের অধিবাসীরা পরদিন সকালেই দল বেঁধে গিয়ে জুটল সমুদ্রের তীরে। তারা দেখল ভাঙা জাহাজটি। জাহাজের নাম—'ক্যালকাটা'। নানারকম জিনিসের সঙ্গে গমের বস্তাও ছিল সেই জাহাজে, কিন্তু কোন জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত দেখা গেল না জাহাজের কোনখানে! তাহলে, নিশ্চয়ই সমুদ্রে ডুবে মারা গেছে তারা সকলে!

সারাদিন ধরে সেই সমস্ত মালপত্র নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি হল। সন্ধ্যা হয়ে এল। বাড়ি ফিরল সকলে। কয়েকটি লোক একটি খামারবাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে চলেছে। হঠাৎ আবছা আলোয় তারা দেখল—এক বিরাটাকার শ্বেতমূর্তি সেই খামারবাড়ির পিছন দিক থেকে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে!

এই মূর্তির কথাই কি ছেলেরা বলেছিল তখন? এর বেশী আর চিন্তা করার সময় তাদের হল না। প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা বাড়ির দিকে ছুটল!···

মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল সে খবর। কেউ আর বাড়ির বাইরে পা বাড়াল না। এক অজানা অচেনা প্রাণীর আবির্ভাবে গ্রাইণ্ডস্টোন দ্বীপের অধিবাসীরা সন্ত্রস্ত হয়ে কাটাল সেই রাত্রিটা।

পরদিন সকাল হতেই তারা দলে দলে গিয়ে হাজির হল তাদের ধর্মযাজক বাউড্রেন্ট্-এর কাছে।

গতকাল তাদের দেখা সাদা দৈত্যের গল্প শুনলেন বাউড্রেন্ট্। শুধু দেখা দেওয়া নয়, সেটি নাকি তাদের আক্রমণ করতেও উদ্যত হয়েছিল!

প্রথমে বাউড্রেন্ট্ তাদের এ বর্ণনাকে কতকগুলি পাগলের প্রলাপ মনে করে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু কয়েকটা ছেলের মুখেও ওই একই রকম

গল্প শুনে অবশেষে ভাবলেন বাউড্রেল্ট্—সম্পূর্ণ না হোক, অন্ততঃ কিছুটা সত্য থাকতে পারে তাদের এ কাহিনীর পিছনে।

তিনি বললেন, বেশ, চলো আমরা দল বেঁধে খুঁজে দেখি দ্বীপের কোথায় সে দৈত্য লুকিয়ে আছে!

তাঁর এ প্রস্তাবে জন বারো লোক রাজী হল। বাকী সকলে বাড়িতে স্ত্রী পুত্র পরিবারকে পাহারা দেবার অজুহাতে একে একে সরে পড়ল।

ওই বারোজন সশস্ত্র লোককে সঙ্গে নিয়ে বাউড্রেল্ট্ মনে মনে ঠিক করলেন, প্রথমে তাঁরা খামারবাড়িটির দিকে যাবেন, তারপর সমুদ্রের ধারে—যেখানে ভাঙা জাহাজটি ভেসে এসে ঠেকেছে, সেইখানে। তুষারঢাকা অঞ্চল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখতে হবে সবাইকে, তুষারের ওপরে অস্বাভাবিক কোন পায়ের ছাপ পড়েছে কি না!

সারা সকাল তাঁরা তুষারঢাকা মাঠ ঘাট পথ প্রান্তর তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। কিন্তু রাত্রে নতুন করে আবার কিছু তুষারপাত হওয়ায় সেই অজানা জীবটির পায়ের চিহ্ন তাঁরা দেখতে পেলেন না। দুপুর গড়িয়ে গেল। সমুদ্রের ধারে ভাঙা 'ক্যালকাটা' জাহাজের কাছাকাছিও অস্বাভাবিক জীবটির অস্তিত্বের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। সকাল থেকে ব্যর্থভাবে ঘোরাঘুরির পর বাউড্রেল্ট্-এর সঙ্গীদের ভয়ও অনেকটা কমে গেল। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসিও শুরু করল তারা।

বাউড্রেল্ট্ও মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন—ছিঃ ছিঃ, কতকগুলি লোকের গাঁজাখুরী গল্পে বিশ্বাস করার ফলে অযথা এই পরিশ্রম করতে হল। হয়রানির একশেষ।

দলটিকে নিয়ে তিনি ফিরে চললেন।

আবার সেই খামারবাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তা। সঙ্গের লোকগুলিকে পিছনে নিয়ে মাথা নীচু করে বাউড্রেল্ট্ এগিয়ে চলেছেন। হঠাৎ বিস্ময়ে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন তিনি! লোকগুলি দ্রুতপদে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। সামনেই তুষারের ওপরে অস্বাভাবিক পায়ের ছাপ। বাইশ ইঞ্চি লম্বা আর চওড়ায় প্রায় বার ইঞ্চির কাছাকাছি।

মনে মনে ভয় পেলেও বাউড্রেল্ট্ আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন—এ কিসের পায়ের ছাপ? কোন দৈত্য, ভূতপ্রেত না তুষার ভালুকের? কিন্তু তুষার-ভালুক পিছনের পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে না। অথবা ইতিপূর্বে এমন দৈত্যাকৃতি কোন প্রাণীর এ দ্বীপে অস্তিত্বের কথাও শোনা যায়নি। তাহলে কোথা থেকে এ কিসের পায়ের চিহ্ন এসে পড়ল এই দ্বীপে?

সাহসভরে সেই পায়ের ছাপ দেখে দেখে এগোতে লাগলেন বাউড্রেল্ট্। সঙ্গের লোকদের সর্বদা অস্ত্র প্রস্তুত রাখতে বললেন। সেই বিরাট পায়ের ছাপ এলোমেলো-ভাবে মাঠের বুক পার হয়ে এগিয়ে গেছে। এদিকে দিনের আলোও কমে আসছে ক্রমশঃ। সেই পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে করতে দ্বীপের আর এক দিকে এসে পড়লেন বাউড্রেল্ট্ তাঁর দল নিয়ে।

তারপরেই তাঁরা এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলেন। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে এক বিরাটাকার শ্বেতমূর্তি নিশ্চলভাবে শুয়ে আছে।

কী প্রাণী হতে পারে এটা? ভাবতে লাগলেন তাঁরা দূরে দাঁড়িয়ে।

অবশেষে অসীম সাহসে ভর করে বাউড্রেল্ট্ পা পা করে এগিয়ে গেলেন সেই মূর্তির দিকে। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে; তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করেও প্রাণের এতটুকু সাড়া ধরা পড়ল না বাউড্রেল্ট্-এর চোখে। তার গায়ে সভয়ে হাত দিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে অবাকবিস্ময়ে যেন থ' হয়ে গেলেন। ঠাণ্ডা খানিকটা তুষারের ভেতরে তাঁর কটা আঙুল ঢুকে গেল। যে জাতেরই প্রাণী হোক এটা, নিশ্চয়ই মরে গেছে; তুষারে ঢাকা পড়েছে তার মৃতদেহ।

তাঁর সঙ্গের লোকেরা এবারে আলো জেলে অত্যন্ত সাবধানে এগিয়ে এল সেই তুষারঢাকা মূর্তির কাছে। মাপ জোক করে দেখা গেল—সেটির দেহের মাপ লম্বায় প্রায় ন' ফুট আর উচ্চতায় আট ফুটের কাছাকাছি। শুধু মাথাটাই তার চার ফুট চওড়া আর তিন ফুট লম্বা।

দলের লোকেরা আলোগুলো তুলে ধরলো। বাউড্রেল্ট্ এবার ঘুরেফিরে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন সেটিকে। কিন্তু প্রাণীটির মুখের দিকে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহসী বাউড্রেল্ট্-এর সারাদেহ মুহূর্তের জন্যে একবার কেঁপে উঠল। দু'টি পাশাপাশি কোটরে দু'টি চোখ আর তৃতীয় একটি কোটর মুখের বলেই অনুমান হয়। নাক বা কান দেখা গেল না।

বাউড্রেল্ট্ ভালভাবে তার চোখের দিকে তাকালেন। তাঁর মনে হল—প্রাণীটির চোখের কোটরের ভেতরে চোখের পাতা দুটো যেন এবার পিট্ পিট্ করে নড়তে লাগল। তারপরেই একটা কষ্টকর গোঙানির আওয়াজ বেরুলো তার মুখ দিয়ে। চার ফুট লম্বা আর দু'ফুট চওড়া দুটো হাত অল্প একটু নড়ে উঠল।

সাহসী বাউড্রেল্ট্ হাঁটু মুড়ে সেটির মুখের কাছে বসে পড়লেন। তাঁর বুকে ঝোলানো রূপোর ক্রশ ঝিক্‌মিক করে উঠল আলো লেগে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীটির গোঙানি আরও জোরে শোনা গেল; আরও জোরে নড়ে

উঠল তার দেহটা। বাউড্রেন্ট্ শুনতে পেলেন, অস্পষ্ট গলায় প্রাণীটির কাতর আর্তনাদ, ফাদার!…ফাদার!

চমকে প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন বাউড্রেন্ট! আনন্দে অধীর হয়ে তাঁর লোকদের চীৎকার করে বললেন, আরে, এ কোন দৈত্য বা ভয়ংকর কিছু নয়। একটা সাধারণ জীবন্ত মানুষ। ক'দিনের একটানা তুষারঝড়ে এর সারা শরীরে এইভাবে হয়তো তুষার জমে গেছে। তুষারের অন্ততঃ ফুটখানেক আস্তরণ পড়ে গেছে এর শরীরে। যাই হোক, এখান থেকে এখন শীগ্গির একে কাছাকাছি কোন বাড়িতে আমরা তুলে নিয়ে যাই চলো।

তারপর সেই ভাঙা 'ক্যালকাটা' জাহাজের একটি তক্তায় সেই তুষারঢাকা মানুষটিকে তুলে অতিকষ্টে গ্রামের মধ্যে বয়ে নিয়ে গেলেন বাউড্রেন্ট্ তাঁর সঙ্গীদের সাহায্যে। তখন তার ওজন ছিল প্রায় এক হাজার পাউণ্ড।

সেই তুষারমানবটিকে বাঁচানোর জন্য গ্রাইণ্ডস্টোনের অধিবাসীদের সঙ্গে সারারাত ধরে পরিশ্রম করতে লাগলেন বাউড্রেন্ট্। প্রথমে ঘা মেরে মেরে তার গায়ের ওপরের জমাট-বাঁধা বরফ টুক্রো টুক্রো করে তাঁরা ভাঙতে লাগলেন। তারপর মাংসের কাছা-কাছির বরফ ঠাণ্ডা তোয়ালে দিয়ে গলিয়ে দেওয়া হল। অবশেষে সেই বরফের আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে পড়ল এক শক্তিমান্ যুবক। দেখতে যেমন লম্বা তেমনি চওড়া তার বুকের ছাতি।

বাউড্রেন্ট্ জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি? তোমার এ অবস্থা কেমন করে হল?

অত্যন্ত দুর্বল ক্ষীণকণ্ঠে লোকটি বলল, আমার নাম অগাস্টি লে বারডেইস্ (Auguste le Bourdais). ধ্বংসপ্রাপ্ত 'ক্যালকাটা' জাহাজে কাজ করতাম। আমি একাই বোধহয় বেঁচে আছি এখনও। আমার এখন যতদূর মনে পড়ছে—'ক্যালকাটা' জাহাজের একটা টুক্রো কাঠ আঁকড়ে ধরে একটা গোটা দিন আর গোটা রাত ঝড়ের মধ্যে সমুদ্রের জলে আমি ভেসেছিলাম। তারপর সেই ভয়ংকর তুষারঝড়ের মধ্যেই এখানে এসে ঠেকলাম। একটা জনপ্রাণীর দেখা পেলাম না। আশ্রয় কোথায়? একটা পরিত্যক্ত খামারবাড়িতে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু সেখানে বিশেষ সুবিধা হল না। চারদিনের তুষারঢালা ঝড় আমার ওপর দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বয়ে গেল। ঝড় একটু কমতে বাইরে বেরিয়ে মানুষজনের সন্ধান করতে চেষ্টা করলাম। আমার দেহ তখন ওই ভাবে বরফে ঢাকা পড়ে গেছে! অতি কষ্টে গোঙাতে গোঙাতে সমুদ্রের ধারে যখন গিয়ে পৌঁচেছি, তখন দূর থেকে দেখতে পেলাম একদল বেপরোয়া ছেলেকে। তারা ভাঙা 'ক্যালকাটা' জাহাজটিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল তখন। আনন্দে

অধীর হয়ে সাহায্যের জন্যে তাদের দিকে আমি ছুটে যেতে চাইলাম। কিন্তু ছুটে বা তাড়াতাড়ি যাওয়া তখন আমার সাধ্যের বাইরে। তারপরেই ছেলেগুলো আমাকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে পালাল! বুঝলাম, আমার এখনকার তুষারঢাকা চেহারা দেখে ওরা ভয় পেয়েছে। সে রাত্রিটাও গেল। পরদিন আবার একদল লোকের মুখোমুখি হলাম। ছেলেদের চেয়ে তারা সাহসী ছিল না। তারাও পালিয়ে গেল। কিন্তু তখন আমার আর এতটুকু ক্ষমতা অবশিষ্ট নেই যে সাহায্যের জন্যে দ্বীপের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ি। তাই সমুদ্রের ধারে তুষারশয্যায় শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় সময় গুনছিলাম, ফাদার!

বাউড্রেন্ট দেখলেন, বরফের মধ্য থেকে লোকটার দেহ তো উদ্ধার করা হল; কিন্তু তুষারকামড়ে (Frost-bite) তার নীচের অঙ্গের এমনি শোচনীয় অবস্থা হয়েছে যে, এখনি তার একটা ব্যবস্থা না করলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আর কালবিলম্ব না করে বাউড্রেন্ট্ আর এক দুঃসাহসী কাজ করে বসলেন। তৎক্ষণাৎ লোকটিকে টেবিলে শুইয়ে দিলেন। জনদশেক লোককে বললেন তাকে জোরে চেপে ধরে রাখতে। তারপর নিজে একটা ধারালো করাত দিয়ে বারডেইস্-এর পা দুটো হাঁটুর ঠিক ওপর থেকে কেটে বাদ দিয়ে দিলেন! তাঁর চিকিৎসা প্রণালীটা যতই অবৈজ্ঞানিক আর বীভৎস হোক্ কাজ হল তা'তে।

কয়েকদিনের মধ্যে বারডেইস্-এর অবস্থার অনেক উন্নতি হল। মে মাসে সে কুইবেকে গেল। একটা হৈ হৈ পড়ে গেল সেখানকার চিকিৎসক-মহলে। সেখানকার হাসপাতালে তার কাটা পা দুটোয় বৈজ্ঞানিক মতে আবার অপারেশন করা হল।

অগাস্টি লে বারডেইস্ গ্রাইণ্ডস্টোন দ্বীপের সেই সাহসী অসীম করুণার প্রতিমূর্তি ফাদার বাউড্রেন্ট্‌কে ভুলবে কেমন করে? সেইসঙ্গে দ্বীপের অধিবাসীরাও যে তার মনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। কুইবেকের হাসপাতালে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠা মাত্রই এক জোড়া কাঠের পা নিয়ে বরাবরের জন্যে গ্রাইণ্ডস্টোন দ্বীপে যাত্রা করল বারডেইস্। তার বংশধররা এখন গ্রাইণ্ডস্টোন দ্বীপের অধিবাসী।

টার্জানের চতুস্ত্রিংশ অ্যাড্‌ভেঞ্চার

—সব্যসাচী

সোনার সহরের রাজা বয়সে তরুণ। ভারি সুন্দর চেহারা, মণিমুক্তায় সেজে সিংহরথে চড়ে যখন রাজপথে ভ্রমণ করেন, প্রজারা ভাবে ইনি দেবতা, ইনিই ভগবান্।

অথচ লোকটির যে দয়ামায়া বলে কোন বস্তু নেই, তারও পরিচয় তারা যখন-তখনই পাচ্ছে। মানুষের জীবন এই রাজার কাছে খেলার জিনিস; এমন দিন যায় না, যেদিন তাঁর পালিত সিংহের মুখে দু-চারটা বন্দীকে তিনি ছুড়ে না ফেলেন।

মজা এই, এতখানি নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও প্রজাদের অটুট ভক্তি তাঁর উপরে। অবশ্য অসন্তুষ্ট লোকও রাজ্যে আছে; কিন্তু তারা মনের ঝাল মনেই রাখে, রাজার কথায় প্রতিবাদ করবার মত সাহস তাদের কখনো হয় না।

দানো ধরা পড়েছে শুনে রাজা নিজে এলেন পল্টন সঙ্গে করে। দুশমনকে ধরে নিয়ে যেতে হবে; রীতিমত জাঁকজমক করেই রাজা এলেন, কাড়া-নাকড়া ঢাক ঢোল বাজিয়ে। সোনার সাঁকো পেরিয়ে এল তাঁর রথ; বারোটা বড় বড় সিংহ সেই রথে জোড়া।

পল্টন গিয়ে দাঁড়াল কূপটা ঘিরে। কিন্তু এ-কী? কূপের ভিতর দানো কই? আর কূপের ভিতর ঐ গাছের গুঁড়িটা কেন? সেই শিকারীটাই বা গেল কোথায়, যে ফাঁদ পাহারা দেবার জন্য এই বনের ভিতরেই ছিল?

রাজা রেগে আগুন! তলব করলেন সেই শিকারীকে, যে তাঁকে খবর দিয়ে এনেছে। "ফেলে দাও সিংহের মুখে! এই মিথ্যুকটা অকারণে কষ্ট দিয়েছে আমার!"

ঠিক সেই সময় কে একজন উপর দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠল—"রাজা! রাজা! ঐ দেখুন!"

রাজা দেখলেন, অন্য সবাইও দেখল। একটা শিকারী গলায় দড়ি-বাঁধা অবস্থায় গাছের ডালে ঝুলছে।

এ কী কাণ্ড? কে ওর এ দশা করল?

রাজা উল্টো বোঝেন—তাঁর ধারণা হল যে, এ তাঁর শত্রুদের কাজ। কে সে শত্রু, দানোকে খালাস করে দিয়ে, একটা তুচ্ছ শিকারীকে ফাঁসীতে লটকে দিয়ে, রাজার শত্রুতা কী করে সে করতে পারে—অত চিন্তা তাঁর করবার দরকার নেই। যারা এর ভিতর জড়িত আছে, সিংহের মুখে ফেলে দাও তাদের। অন্য শত্রুদের পরে খুঁজে দেখা হবে, এখন সমুখে পাওয়া যাচ্ছে যে লোকটাকে, তাকে আগে দাও সাবাড় করে।

রাজার রথ থেকে বড় একটা সিংহকে খুলে আনা হল। শিকারীটা ভয়ে বেহুঁসের মত দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে। তাকে যে কেন আচম্কা এভাবে মরতে হবে, তা তার মাথায় কোনমতেই যেন ঢুকতে চাইছে না।

সিংহটাকে এনে ওর সমুখে দাঁড় করানো হল। সিংহ শুঁকে দেখল ওকে। তারপর লোকটাকে বলা হল ছুটে পালাতে।

পালানো? আশার আলো ঝলকে উঠল ওর চোখে। কিন্তু সে এক পলকের জন্য। পালানো যে যায়ই না এ-রকম ক্ষেত্রে, তা ওর মনে পড়ে গেল। মানুষটা একশো গজ এগিয়ে যাবার পরই অবশ্য সিংহটাকে খুলে দেওয়া হবে; কিন্তু একশো গজ আগের লোককে ধরে ফেলতে সিংহদের বেশী সময় লাগে না। গাছে উঠে জীবন রক্ষার চেষ্টার নিয়ম নেই; সে-চেষ্টা কেউ করলে, তাকে তখনই ধরে নামিয়ে আনা হবে, আর দৌড়ঝাঁপের সুযোগ না দিয়ে তক্ষুণি সোজাসুজি ফেলে দেওয়া হবে সিংহের মুখে।

কাজেই, পালানোর আশা কিছুমাত্র নেই।

তবু, একটা চেষ্টা! চেষ্টা বিফল হবে জেনেশুনেও একটা চেষ্টা সবাই করে। এ-লোকটাও করবে।

সংকেত হল—ঢাকের উপর এক ঘা! সেই সংকেত পেয়ে লোকটা ছুটল বন ভেঙ্গে, ঝোপঝাড় আগাছা ভেদ করে। আশা এই যে ঘন জঙ্গলের আড়ালে যেতে পারলে সে হয়ত যা-হোক একটা উপায় করতে পারবে জীবন বাঁচাবার জন্য।

একশো গজ যেতে না যেতেই পিছনে একটা হুংকার উঠল। সিংহকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে শিকার ধরবার জন্য; এ তারই হুংকার। এক এক লাফে এক একটা ঝোপ অতিক্রম করে পশুরাজ ছুটল তার খাদ্যের পিছনে।

ঝোপঝাড়ের আড়াল? মানুষের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব, সিংহের চোখকে নয়। অভ্রান্ত-ভাবে ছুটে আসছে রক্তপাগল জানোয়ারটা—

যা-হোক একটা উপায়?—গাছগুলো মোটা মোটা; ডালপালা অনেক উপরে; উঠতে সময় লাগবে অনেক। ততক্ষণে সিংহ এসে এক লাফে তাকে টেনে নামাবে।

লোকটার মরণশ্বাস উঠেছে। ছুটতে ছুটতে টলে পড়তে যাচ্ছে বার বার। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়, মুখে উঠছে ফেনা। বারে বারে কাঁধে হাত দিচ্ছে; যেন হাত বুলিয়ে দেখছে—সিংহটা এসে কাঁধে পড়েছে কি না!

ঐ! ঐ! সিংহ আর দশ হাত দূরেও নেই!

একটা বড় গাছের তলা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল লোকটা। সিংহটাও যাবে, কিন্তু তার আর যাওয়া হল না। গাছ থেকে নেমে এল মোটা একগাছা লতার দড়ি; তার মুখের ফাঁস এমনভাবে জড়িয়ে গেল সিংহের গলায় যে দৌড়ের মুখে আচম্‌কা পিছ-টান লেগে উল্‌টে সে পড়ে গেল গাছতলায়।

ফাঁসটা এমন আঁটো হয়ে গলায় বসল যে, জোর গলায় একটা হাঁক ছাড়বার শক্তিও রইল না সিংহের। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে সে সমুখপানে ছুট্ দেবার উদ্যোগ করছে আবার—

এমন সময়ে গাছের ডাল থেকে ঝুলে নেমে পড়ল টার্জান, আর পড়ল ঠিক ক্রুদ্ধ পশুরাজের পিঠের উপরে।

পরের মুহূর্তেই তার ভোজালি আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল সিংহের উদরে। আর্তনাদের পর আর্তনাদ! সিংহের মরণ-যাতনার চীৎকারে অবাক্ হয়ে পিছন ফিরে তাকাল পলায়মান শিকারী; আর এদিকে অবাক হয়ে সমুখ পানে ছুটল সোনা-সহরের পল্টন।

মরা সিংহটার গলা থেকে দড়ির ফাঁস খুলে নিল টার্জান। দড়ি বেয়ে গাছে উঠে যাবে, এমন

সময় একটা ভয়ংকর দৃশ্য চোখে পড়ল তার। সিংহবধ করে যে-শিকারীটাকে সে উদ্ধার করেছে, তার জীবন আবার বিপন্ন। পিছনে তার স্বয়ং দানো!

দানো এসেছে টার্জানকে খুঁজতে। জীবনদাতার উপর এত অনুরক্ত হয়েছে দানো যে, তার তিলেক অদর্শনও সে সইতে পারছে না। টার্জানের সমুখে শিকারীটাকে দেখেই সে ধরে নিয়েছে যে, শত্রুতা সাধন ছাড়া ওর আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। তাই বন্ধুর শত্রুকে শেষ করে দেবার জন্য সে লাফ দিতে উদ্যত হয়েছে, ছোট্ট একটা ঝোপের ওদিক থেকে।

টার্জান পড়ল ঠিক পশুরাজের পিঠের উপর। [পৃঃ ৪২৯

টার্জান সিংহভাষায় তাকে বলে উঠল—"বন্ধু! বন্ধু! এ-বেচারীকে মেরো না। ওকে আমি এই মাত্রই বাঁচিয়েছি। তোমার ক্ষিদে পেয়ে থাকে যদি, চলো, এক্ষুণি একটা হরিণ মেরে দু'জনে ভাগাভাগি করে খাব।"

অবাক্!

সোনা-সহরের পল্টন এসে পড়েছে! এসে পড়েছেন সিংহ-রথে চড়ে স্বয়ং রাজা। বেশ কিছুটা দূর থাকতেই অবাক হয়ে রাজা দাঁড়িয়ে পড়লেন। দাঁড়িয়ে পড়ল সোনা-সহরের পল্টন।

একটা আশ্চর্য চেহারার মানুষ! আর সেই দানো!

গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানুষটা আর পশুটা! এত বড় সিংহও আর কেউ দেখেনি; এত লম্বা-চওড়া মানুষও না। অবাক হয়ে সেই হাজার মানুষ তাকিয়ে রইল সেই জুড়িটার দিকে।

লোকগুলোর দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে টার্জান মৃদুস্বরে দানোকে বলতে লাগল—"বন্ধু! ওদের বিশ্বাস নেই। তুমি এইবেলা তীরবেগে ছুটে ঘন জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যাও। আমি এই দড়ি বেয়ে

গাছে উঠে পড়ব বেকায়দা দেখলে। তবে ওরা যদি ভাল ব্যবহার করে, আমি ওদের সঙ্গে একবার ওদের সহরে যেতেও পারি। অর্থাৎ, আমি যদি এখুনি তোমার কাছে ফিরে না যাই, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমার অনিষ্ট করতে পারে, এমন সাধ্য ওদের নেই।"

ঘড়র ঘড়র শব্দে দানো আপত্তি করল। দারুণ আপত্তি। "এরা লোক ভালো নয় বন্ধু! তুমি কক্ষণো যেও না ওদের সহরে। আমি জঙ্গলে ঢুকছি; তুমিও গাছে ওঠো।"

আরও খানিকক্ষণ দু'জনে কথা-কাটাকাটি হল। শেষ পর্যন্ত দানো পিছন ফিরল বটে, কিন্তু বারবার ঘড়র ঘড়র শব্দে জানিয়ে গেল—সহরে টার্জানের যাওয়া মোটেই দানোর মনঃপূত নয়। গেলেই বিপদ ঘটবে।

যাই হ'ক, দানোও তিন লাফে জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল,—রাজার দিক থেকেও উঠল কয়েক শো লোকের সমবেত চীৎকার। "গেল! গেল! দানো পালিয়ে গেল!"

সবাই ছুটে আসছিল দানোর পিছু নেবার জন্য; নিষেধ করলেন রাজা। রাজার মাথায় রাজবুদ্ধি ত! তিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পেলেন—দানোর জিওনকাঠি মরণকাঠি তাঁর হাতে এসে গিয়েছে। সিংহরথ থেকে নেমে দুই হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে তিনি টার্জানের দিকে এগিয়ে এলেন।

সেই হাজার সৈনিক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রাজার পানে।

রাজা হাসিমুখে টার্জানের দিকে এগিয়ে এলেন।

সিংহাসন বা সিংহরথ! এই দুটো জিনিসের উপর ছাড়া তাদের রাজাকে চর্মচক্ষে তারা কখনো দেখে নি। তিনি যে অন্য পাঁচজনের মত মাটিতেও হাঁটতে পারেন, এ তাদের ধারণার অতীত ছিল। তাই ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তারা তাকিয়ে রইল রাজার দিকে।

রাজা মধুর হাসি হেসে বললেন—"বন্ধু, আপনি কে, তা জানি না। সিংহদের দেবতা না কি আপনি? এই একটা সিংহ মরে পড়ে আছে আপনার আঘাতে; আর ঐ একটা সিংহ আপনার পাশে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল অনুগত ভক্তের মত। মানুষ এভাবে সিংহকে বধ করতে পারে, বা তার ভালোবাসা আকর্ষণ করতে পারে, এ আমরা বিশ্বাস করি না। তাই সন্দেহ হচ্ছে, আপনি হয়ত সিংহদেরই দেবতা। তা যদি হন, তবে প্রসন্ন হোন আমার উপরে। চলুন আমার নগরে। আমি আপনাকে সোনার মন্দির গড়ে দেব। সেখানে সিংহবেষ্টিত হয়ে আপনি আরামে বাস করবেন। আপনার নিত্য পূজা হবে। আপনার প্রিয়বস্তু দিয়েই ভোগ হবে আপনার।

গ্রামে বাস করার সময়ে এক ইহুদী ব্যবসায়ীর সংস্রবে টার্জানকে আসতে হয়েছিল। তাইতে হিব্রুভাষা কতকটা আয়ত্তে এসেছিল তার। আশ্চর্য হয়ে সে শুনল—রাজার কথার ভিতর পনেরো আনাই হিব্রু শব্দ। বুঝতে তার বিশেষ কষ্ট হচ্ছে না।

সেই ভাষাতেই টার্জান উত্তর দিল। সিংহের দেবতা সে নয়—মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করল সে। তবে সিংহের ভাষা সে জানে; যেমন জানে অন্য জানোয়ারদেরও অনেকেরই ভাষা। তারই দরুণ সিংহদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা তার পক্ষে সহজ। আর সিংহ বধ করা? সেটাও তার পক্ষে সহজ; কারণ গায়ে তার জোর আছে; মনে তার ভয় নেই। নগরে যাওয়া? রাজা যদি অনুরোধ করেন, তবে নগরে যেতে বা দুই একদিন সেখানে বাস করতে তার আপত্তি নেই। তবে তার জন্যে সোনার মন্দির তৈরী করে দেওয়ার কোন দরকার হবে না, বা মন্দির তৈরী করে দিলেও সে তাতে বাস করবে না। তার নিজের বাসস্থান আছে; নিজের আপনজন আছে; তাকে তাদের কাছে শীঘ্রই ফিরে যেতে হবে।

রাজা হাসিমুখেই বললেন—"তাই হ'ক বন্ধু, তাই হ'ক। দুই একদিনের জন্যই আপনি আমাদের নগরে চলুন। দেবতা না হলেও আপনি দর্শনীয় মানব; নগরের সবাই আপনার দেবতার মত দেহসৌষ্ঠব দেখে আনন্দ পাক, এই আমার কামনা। মন্দিরের কথা আর তুলব না; আপনি আমার রাজপ্রাসাদেই থাকবেন; রাজ-অতিথি হয়ে।"

মনে মনে ধূর্ত রাজা ফন্দী আঁটছেন—'চল তো বাছাধন নগরের ভিতর; তারপর তোমায় দিয়ে কত কাজ করিয়ে নিই, দেখতে পাবে।'

দানো এই সাদা মানুষটার অনুগত। একে দিয়ে দানোকে ধরিয়ে আনতে হবেই। দানোকে এতদিনে নিজের চোখে দেখেছেন রাজা। বেল্‌সার-এর চাইতে দানো শ্রেষ্ঠ—একথা স্বীকার করতে এখনও তাঁর মন চাইছে না। তবু এটা তিনি এখন মানতে রাজী আছেন যে, দুনিয়ায় বেল্‌সার-এর সমকক্ষ সিংহ যদি থাকে, তবে সে এই দানোই।

* * * *

বেল্‌সার! বেল্‌সার! সোনার সহরের লোকে জোরগলায় তার নাম উচ্চারণ করে না। সবাইয়েরই ধারণা ওটা আসলে সিংহ নয়, সিংহরূপী একটা রাক্ষস। এ-রাজ্যে একটা কিংবদন্তী আছে। বর্তমান রাজার বাবা পুত্রকামনায় অনেক ক্রিয়াকর্ম করেছিলেন; অনেক ডাইনীর তোয়াজ করেছিলেন অনেক ভাবে। সেই ডাইনীদের বরে বুড়োবয়সে এই একমাত্র পুত্র তিনি লাভ করেন। যেদিন জন্ম হল রাজপুত্রের, রাজার সিংহশালায় এক সিংহীও শাবক প্রসব করল সেইদিন। ডাইনীরা

কী সব ওষুধ-বিষুধ খাইয়ে দিল ঐ সিংহশাবককে। আর রাজাকে বলল—"এই সিংহশাবক যতদিন সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকবে, ততদিন তোমার পুত্রের কোন অনিষ্ট কেউ করতে পারবে না।"

সেই থেকে সেই সিংহশাবক রাজপুত্রের মতই আদরে যত্নে পালিত হ'তে লাগল রাজার বাড়িতে। সেই সিংহশাবকই এখন বিরাট্-দেহ বেল্‌সার; আর সেই রাজপুত্রই এখন রাজা। নিজের ভালমন্দ বেল্‌সারের ভালমন্দের সঙ্গে জড়িত—এই বিশ্বাস রাজার মনেও বদ্ধমূল; আর সেইজন্যই বেল্‌সারের আরামের জন্য রাজকীয় ব্যবস্থা আছে প্রাসাদে। তার বসবাসের জন্য কয়েকখানা আলাদা ঘরই নির্দিষ্ট আছে; রাজার নিজের মহলের পাশেই। রাজা যতক্ষণ নিভৃত কক্ষে থাকেন, বেল্‌সারও সে-কক্ষে থাকে। রাজা যখন দরবারে বসেন, বেল্‌সারও বসে তাঁর পাশে। তবে সব সময়ই শিকল দিয়ে বাঁধা থাকে সে। সে শিকল খুব শক্ত ও মোটা হলেও আগাগোড়া সোনা দিয়ে গড়া।

টার্জান রাজপ্রাসাদে ঢুকেই প্রথমে দেখল এই বেল্‌সারকে; রাজার বিশ্রামকক্ষে। টার্জানকে দেখেই বজ্রনাদের মত একটা হুংকার দিয়ে বেল্‌সার চকিতে লম্ফ দিল তাকে লক্ষ্য করে। ঝন্-ঝন্ শব্দে বেজে উঠল সোনার শিকল; টার্জান হাত দিল কোমরের ভোজালিতে।

শিকলটা সত্যই অসাধারণ-রকম মজবুত; বেল্‌সারের মত সিংহদানবের প্রচণ্ড শক্তিও তাকে ছিন্ন করতে সক্ষম হল না।

রাজা একটা হাত উঁচু করে শান্ত হতে বললেন বেল্‌সারকে। তাঁর চোখের দৃষ্টি কিন্তু বরাবর রয়েছে টার্জানের উপর। বেল্‌সারের আক্রমণ আসন্ন দেখে এই সাদা মানুষটির ভাবে ভঙ্গীতে ভয়ের লক্ষণ প্রকট হয় কি না, তাই তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে লক্ষ্য করছিলেন।

হতাশ হ'তে হল রাজাকে। তিলমাত্র চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল না এই অদ্ভুত মানুষটার ভিতরে। এক পা পিছিয়ে যায়নি, মুখচোখের এতটুকু ভাবান্তর হয়নি, ভোজালিতে হাত দেওয়া ছাড়া কোনরকম অঙ্গচালনাও করেনি টার্জান। ভয়ভক্তির একটা মিশ্রিত অনুভূতি জেগে উঠল রাজার অন্তরে।

"বেল্‌সার সম্বন্ধে আপনার কী রকম ধারণা?"—কৌতুকের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন রাজা।

"বেশ বড় সিংহ, বেশ তেজী জানোয়ার।"—নির্বিকারভাবে উত্তর দিল টার্জান।

"আপনি দানোকে ভালোরকমই জানেন। সে কি এই বেল্‌সারের সমকক্ষ?"—মনের কথা মুখে প্রকাশ হয়ে গেল রাজার।

"দানো?"—ভ্রূকুঞ্চিত করে টার্জান চিন্তা করতে লাগল। তার প্রিয় সেই অতিকায় সিংহটি যে একটা আপত্তিজনক নামে এ-সহরের লোকের কাছে পরিচিত, তা তো সে জানে না!

রাজা তার সমস্যা বুঝলেন। বুঝিয়ে দিলেন যে দানো বলতে তাঁরা কাকে বোঝেন।

"দানো।"—একটু অসন্তোষ ফুটে বেরুলো টার্জানের কথার ভিতর থেকে। "এমন সুন্দর সিংহটিকে আপনারা বলেন দানো? আমি তো যতক্ষণ ওর সঙ্গে ছিলাম, 'অ্যাপোলো' বলে ডেকেছি ওকে। অ্যাপোলো জানেন তো? সূর্যদেবতার নাম হলো অ্যাপোলো।"

রাজার মুখ কালো হয়ে এলো। সূর্যদেবতা? সেই অলক্ষুণে দানোটার খুবই পক্ষপাতী তো মানুষটা! বেল্‌সার সেইজন্যই একে অপছন্দ করেছে; দেখা মাত্রই আক্রমণ করতে গিয়েছিল সেই কারণেই। কে শত্রু কে মিত্র, পশুরা তা প্রথম নজরেই বুঝতে পারে। এ-লোকটা যে বেল্‌সারকে দানোর চাইতে ছোট মনে করে, তা বেল্‌সারের অজানা নেই।

কিন্তু ধূর্ত রাজা ও-কথা আর বাড়াতে চান না। টার্জানকে দিয়ে কাজ পেতে চান তিনি। তাকে সন্তুষ্ট রাখা দরকার।

অন্য কী কথার আলোচনা টার্জানের সঙ্গে করা যায়, বোধহয় সেই কথাই রাজা ভাবছিলেন। এমন সময় তাঁর এক সর্দার এসে জানাল—দক্ষিণের পাহাড়ে একটা গুপ্তচর ধরা পড়েছে, চেহারা দেখে আরব মনে হয়। অবশ্য আরবদের মত কথা সে বলে না; কী ভাষায় যে বলে, তা বুঝতে পারে না কেউ।

রাজা গম্ভীরভাবে আদেশ দিলেন—"গুপ্তচর যখন, সিংহের খাঁচায় ফেলে দাও। বেল্সার সান্ধ্যভোজ সেরে নিয়েছে; অন্য কোন বড় সিংহের ভোজে লাগুক বদমাশটা।"

সর্দার আভূমি-নত হয়ে অভিবাদন জানাল; তারপর চলে গেল আদেশ পালন করতে।

রাজা বললেন—"চলুন বন্ধু, খানিকটা খেলা দেখা যাক্।"

খেলা? সিংহের খাঁচায় জ্যান্ত মানুষ ফেলে দেওয়ার নাম খেলা? ঘৃণায় ক্রোধে মনটা বিষিয়ে উঠল টার্জানের। কিন্তু সে এই রাজার অতিথি, হঠাৎ কোন অসৌজন্য প্রকাশ করা উচিত হবে না এঁর প্রতি! তাই সে নীরবে অনুগামী হল রাজার।

খাঁচা তো নয়, একটা ছোট উঠান। চারিদিকে দোতলা সব ঘর; মাঝখানে কতকটা খোলা জায়গা। দোতলার বারান্দায় রাজার স্বর্ণাসন রাখা হয়েছে; রাজা তাতে বসলেন। রাজার সমুখে অন্য কারও আসন গ্রহণ করবার রীতি নেই এ দেশে, কাজেই অন্য কোন আসনও নেই সেখানে। কয়েকজন সর্দার ও মন্ত্রীজাতীয় লোকের সঙ্গে টার্জানও দাঁড়িয়েই দেখতে লাগল।

উঠানে একটা বড় সিংহ ঝাঁপ দেবার জন্য তৈরী হচ্ছে; আর একেবারে উঠানের অন্য প্রান্তে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে। লোকটিকে দেখেই চমকে উঠল টার্জান। সিংহ লাফ দেবার আগেই সে লাফিয়ে পড়ল উঠানে। না দিয়েই বা সে করবে কী? লোকটি যে রবিন!

[পঞ্চত্রিংশ অ্যাড্ভেঞ্চার পরে বাহির হইবে।

● সুদূরের বাণী—

যার যেমন ভাব সে তেমনি দেখে। তমোগুণী ভক্ত নিজে মাংস খায়, তাই ভাবে মা-ও পাঁঠা খাবে—তাই বলিদান দেয়। রজোগুণীর বিস্তারে বিলাসে বিশ্বাস, তাই সে নানান ব্যঞ্জনে ভোগ সাজায়। সত্ত্বগুণীর জাঁক নেই, জৌলুস নেই। তার পুজো লোকে জানতেও পারে না। ফুল নেই তো, বেল পাতায় আর গঙ্গাজলে পুজো করে। শীতল দেয় দু'টি মুড়কি বাতাসা দিয়ে।

আর আছে ত্রিগুণাতীত ভক্ত। যে শুধু নাম করে। ঈশ্বরের নাম করাই তাঁকে পুজো করা।

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ঝুমরার নরখাদক

—সুষমা সেন

'হাজারীবাগ, ১৩ই মে—এখানে প্রাপ্ত একটি সংবাদে প্রকাশ যে, পুসালী গ্রামের সুখিয়া নামে এক বালিকা একটি নরখাদক ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হইয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ যে, উক্ত বালিকা অপর আর কয়েকটি গ্রাম্য বালিকার সহিত জঙ্গলে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল। ঐ সময়ে হঠাৎ একটি ব্যাঘ্র তাহাকে আক্রমণ করে এবং তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যায়।

প্রাপ্ত অপর একটি সংবাদে জানা যায় যে, এখান হইতে দুই মাইল দূরে কারয়াবাদ গ্রামে গত সপ্তাহে একটি নরখাদক ব্যাঘ্র কর্তৃক দুই ব্যক্তি নিহত হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ যে, একদল গ্রাম্য শিকারী তীর-ধনুক লইয়া একটি নরখাদক ব্যাঘ্রকে তাড়া করিয়া ঘেরাও করিবার পর ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রটি শিকারী দলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং তাহাদের দুইজনকে নিহত করিয়া অক্ষত দেহে নিকটবর্তী জঙ্গলে পলাইয়া যায়। প্রকাশ, উক্ত অঞ্চলে ব্যাঘ্রটি 'ঝুমরার নরখাদক' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে।'

দৈনিক সংবাদপত্র থেকে আমি ঐ খবরটা আনন্দ ও ধরমবীরকে পড়ে শোনালাম। আনন্দ বললে, "গত তিন বৎসর যাবৎ ঐ ম্যান-ঈটারটা ঐ অঞ্চলে তার দোর্দণ্ড প্রতাপ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু—"

কথাটা লুফে নিয়ে ধরমবীর বললে, "কিন্তু কোন শিকারী আজ পর্যন্ত তাকে বধ করতে পারেনি। সত্যি, নিতান্ত লজ্জার কথা! এর সঙ্গে পুলিসের তুলনা করতে পার তুমি। পুলিসের একাধিক নরহত্যার আসামীকে গ্রেপ্তার করতে অপারগ হওয়ার খবর আমরা যেমন কাগজে দেখতে পাই।"

আমার দিকে ফিরে আনন্দ পুনরায় বললে, "ঠিক কথা, কিন্তু আমি বলি তোমার যদি সৎসাহস থাকে তবে তুমি ওখানকার অধিবাসীদের ত্রাস ও বিপদকে দূর করবার চেষ্টা করতে পার।"

"বাবুজী, চিঠি আপনার।" মুখ তুলে দরজার দিকে তাকালাম। আমাদের কথাবার্তার মধ্যেই মনে হয় ডাকপিয়ন এসে অপেক্ষা করছিল। পিছন ফিরে চেয়ার কাত করে শরীরটা দরজার দিকে ঝুঁকিয়ে ওর হাত থেকে নিলাম চিঠিখানা। ঠিকানার

হস্তাক্ষর প্রায় অপরিচিত মনে হল। তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা চোখের সামনে তুলে ধরলাম। তাতে লেখা,

প্রিয় মিঃ কাপুর,

আপনি অবগত আছেন কিনা জানি না, গত তিন বৎসর যাবৎ এই অঞ্চলে একটি বাঘ অত্যন্ত আতঙ্ক ও বিপদের সৃষ্টি করেছে। ঝুমরা পাহাড়ের কোলে যে সমস্ত গ্রাম আছে, তার লোকসংখ্যা কম নয়। এদের জীবনধারণের প্রধান উপায় হোল কৃষি ও বন-সম্পদ আহরণ; কিন্তু গত কয়েক বৎসর এই গ্রামাঞ্চলের লোকেরা অর্ধাশনে ও উৎকণ্ঠায় থাকতে বাধ্য হয়েছে। এমন একটি গ্রামও বাদ নেই যেখান থেকে কিছু না কিছু লোক বাঘের পেটে গেছে। সরকারী হিসাবে দেখা গেছে যে, সাতটি গ্রামের বাইশজন ব্যক্তি ঐ কয়েক বৎসরের মধ্যে নিহত ও ভক্ষিত হয়েছে। গরু-মহিষাদির সংখ্যা অগণ্য। শিকারে আপনার সুখ্যাতি বহু দূরবিস্তৃত। আমরা আশা করি আপনি ঐ নরখাদকটিকে হত্যা করে এখানকার গ্রামবাসীদের মনে শান্তি ফিরিয়ে আনবেন। আপনি যদি আসেন তবে দানিয়া স্টেশনে নেমে উত্তর-পশ্চিম দিকে পঁয়তাল্লিশ মাইল পদব্রজে কিংবা গরুর গাড়িতে আসবেন। আমাদের লোক আগামীকাল ট্রেনের সময়ে দানিয়াতে অপেক্ষা করবে। এখানকার বিপন্ন অধিবাসীরা আপনার মুখ চেয়ে বসে আছে। আশা করি তাদের বিমুখ করবেন না।

বিনীত
বি. পি. দুবে
ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট।

চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পাঠান্তে নিঃশব্দে এগিয়ে দিলাম ওদের দিকে। ধরমবীর ও আনন্দ ঝড়ের আগে এঁটো পাতার মত তৈরী হয়েই ছিল। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো তারা, বললে, "তল্পি-তল্পা গুটিয়ে ফেলি। সন্ধ্যায় ট্রেন।"

আমরা যখন পুসালীতে গিয়ে পৌঁছালাম, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার জমাট বাঁধতে শুরু করেছে, আর সেই অন্ধকারে অবাক বিস্ময়ে দেখলাম সমগ্র গ্রামখানায় এক ভয়াবহ নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। কোন জনপ্রাণী বা বাতির ক্ষীণ আলোর শিখা পর্যন্ত নজরে পড়লো না সেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে। অতএব বুঝতে পারা গেল, কি ভয়ংকর আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে ঐ নরখাদক। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর গ্রামের 'মুখিয়াজী'র দর্শন পাওয়া গেল। আমাদের আসার কারণ পূর্বে অবগত হলেও তার মুখে যেন বিশেষ আশার সঞ্চার হোল না।

পর পর কয়েকটি মানুষের প্রাণসংহারে তারা যেন নিজেদের অভিশপ্ত মনে করছিল এবং ফলে জঙ্গলের বাঘকে আর তারা শুধু বাঘ বলেই গণ্য করতে পারেনি। তাদের ধারণা হয়ে গেছে কোন এক অপদেবতা বাঘের রূপ ধরে ঐ কয়েকটি গ্রামের ওপর কোপ বর্ষণ করে চলেছে।

সেই রাত্রে আর বিশেষ কোন কথাবার্তা হোল না। আর দুদিনের ভ্রমণে আমরাও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, আগামী কাল সকালে খোঁজ-খবর নেবার ইঙ্গিত জানিয়ে তিনি আমাদের বিদায় দিলেন। আমাদের থাকার বন্দোবস্ত আগেই করে রাখা হয়েছিল একটা খড়ো চালের মাটির ঘরে। আমরা সেইদিকে রওনা হোলাম। আমাদের সঙ্গে যারা এসেছিল তারা যে কখন সটকে পড়েছে খেয়াল করিনি। নিজেদের চারজন কুলী ছাড়া ধারে কাছে তাদের আর কেউ নেই

ধরমবীর চারদিকে সন্দিগ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে, "মনে হচ্ছে আজ রাত্রে হয়ত এখানেই বাঘের দর্শন মিলবে।"

সহাস্যে আমি বললাম, "তেমন সৌভাগ্য করে কি এসেছি ?"

পরদিন সকালে চা পানান্তে রাইফেলে গুলী ভর্তি করে আমি পাহাড়ের দিকে রওনা হোলাম। সঙ্গে ছিল ছয়জন পালামৌবাসী। জঙ্গল ও বনপ্রাণী বিষয়ের ওয়াকিবহাল মহলের লোক তারা।

ঝুমরা পাহাড়ের গায়েই এই গ্রাম। বরং বলা যেতে পারে বনসম্পদের মধ্যে পাহাড়ের খাঁজে গ্রাম তৈরী করা হয়েছে। গ্রাম মানে কয়েকটি মেঠো বাড়ি। পাহাড়ের ওপর থেকে বন্য হিংস্র প্রাণীদের যে গ্রামে আনাগোনা করায় কোন বাধা নাই সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না।

একটা পায়ে চলা পথ ধরে আমরা এগোচ্ছিলাম। এই পথের ধারে ধারে দুটি রেখা সমান্তরালভাবে এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের অন্য প্রান্তে চলে গেছে। মোষ বা বলদের গাড়ি এই পথেই চলে থাকে।

গ্রামের সমতল থেকে আমরা প্রায় চারশো ফুট ওপরে উঠেছি। বড় বড় পাথুরে ঢিবির গায়ে পায়ে চলা পথটা মোচড় খেয়ে ডাইনে ঘুরে গেছে আর এইখান থেকেই শুরু হয়েছে ঘন জঙ্গল। রাস্তার দু'পাশে বনতুলসী আর মেহদী গাছের মত একপ্রকার কাঁটাবহুল গাছ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও বড় বড় নাম না জানা গাছের তলা দিয়ে, কোথাও আবার বাঁশবনের পাশ দিয়ে পথটা ঘুরে ঘুরে নিবিড়তম অরণ্যের মধ্যে চলে গেছে।

হঠাৎ ঝরনার জলের শব্দ শুনে থেমে পড়লাম। গাছপালা ভেদ করে মুগ্ধ বিস্ময়ে চারিদিকে তাকালাম। প্রকৃতির নয়ন জুড়ানো এমন রূপ কখনও দেখিনি।

বড় বড় কালো পাথরের চাঙড় মসৃণ হয়ে হঠাৎ নীচের দিকে নেমে গেছে। তারই ধারে যেখানে আবার আর একটা উঁচু পাহাড়ের পাদদেশ……ঠিক এই দুটির সংযোগস্থলে নাচতে নাচতে ওপর থেকে নেমে আসছে ক্ষীণকায় এক ঝরনা-স্রোত। প্রায় পনের ফুট উঁচু থেকে জল লাফিয়ে পড়ছে নীচে। সাদা সাদা পুঞ্জীভূত মেঘের মত ফেনা আর বুদ্বুদ সৃষ্টি করে ঘুরপাক খেতে খেতে বালুকা-চড়া-পড়া নদীর মত বুক চিরে ধীর গতিতে এগিয়ে গেছে নীচের দিকে।

একজন লোক বললে, "তিন বৎসর আগে এইখানেই বাঘটা একটা মেয়েকে হত্যা করে প্রথম।"

বাঘের চরিত্র ও কার্য সম্বন্ধে তখনও আমার সুস্পষ্ট ধারণা হয়নি। পুরো বিবরণ তখনও যোগাড় হয়নি। বড় পাথরগুলো লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে নীচে জলার ধারে নেমে এলাম। সেখান থেকে উঁচুতে তাকিয়ে দেখলাম শত শত ফুট ওপর থেকে নিবিড় গাছপালা ভেদ করে তীব্রগতিতে জলধারা নেমে এসে আছড়ে পড়ছে আমাদের পায়ের কাছে।

লোকটা বললে, "গাঁয়ের মেয়েরা মেঠো পথ দিয়ে পানীয় জল নিতে আসতো এখানে। আসতো তারা দল বেঁধে কলসী কাঁখে করে। গ্রামের শেষ প্রান্তে আপনি যে পোড়ো-বাড়িটা দেখেছেন, সেই বাড়িতে এক বুড়ী তার পনের বৎসরের নাতনিকে নিয়ে থাকতো। ঘটনার দিন ঐ মেয়েটি গ্রামের আরো জন দশেক মেয়ের সঙ্গে জল নিতে আসে।

বাঘটি সম্ভবতঃ জল খেতে এসেছিল পাহাড়ের অন্য দিক থেকে। মেয়ের দলকে সে বোধহয় আসতে দেখেছিল কোন ঝোপের অন্তরাল থেকে। আমাদের ধারণা বাঘটা ঐ ঝোপটাতে অপেক্ষা করছিল, কারণ ওখানকার মাটিতে নখের আঁচড় দেখেছিলাম পরে।"

লোকটা আমার বাঁদিকের একটা ক্ষুদ্র ঝোপের প্রতি আঙুল দেখালো। আমি তীব্র দৃষ্টিতে প্রতিটি গাছগাছড়া লক্ষ্য করে সন্তুষ্ট হোলাম। হ্যাঁ, একটা কেন চারটে বাঘ মানুষের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে ওখানে লুকিয়ে থাকতে পারে।

লোকটা আবার শুরু করলো, "মেয়েগুলো তাদের কলসী ঐ ঝরনার জলে পূর্ণ করেছিল, তারপর পাথরের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার মত তারা পর পর উঠে আসছিল। সর্বশেষে ছিল ঐ বুড়ীর নাতনি। হঠাৎ তারা কলসী ভেঙ্গে পড়ার শব্দ আর আর্তনাদ শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো…একটা প্রকাণ্ড বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঐ মেয়েটার ঘাড়ে। চোখের পলকে তাকে টেনে নিয়ে গেল এই বালির বুকে। মেয়েগুলো ভয়ে একসঙ্গে চীৎকার করতে করতে

প্রাণপণে দৌড়োতে লাগলো আমাদের গ্রামের দিকে। আমরা যখন খবর পেলাম তখন প্রায় আধ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে বিশজন লোক, লাঠি, টাঙ্গী, বল্লম, তীর, ধনুক নিয়ে ছুটে এলাম এখানে। বালির বুকে জমাট রক্তের চাপ…তার ওপর বাঘের পায়ের ছাপ, কিন্তু মেয়ে বা বাঘটাকে কোথাও দেখলাম না। রক্তের দাগ অনুসরণ করে আমরা এগিয়ে গেলাম প্রায় দুশো গজ। একটা কাঁটা গাছের গায়ে শাড়ীর ছিন্ন অংশ লেগে রয়েছে। আবার রক্তের দাগ খুঁজলাম। অনেকক্ষণ পরে আরো একশো গজ দূরে পেলাম পুরো শাড়ীখানা। সেখানে প্রচুর রক্ত পড়েছিল। পুনরায় দাগ লক্ষ্য করে বাঘের সন্ধানে এগিয়ে চললাম আমরা। আশ্চর্য হোলাম তিনশো গজ পরে আবার বন-বাদাড় ভেঙে বাঘটা শিকার মুখে করে এই জলার ধারেই ফিরে এসেছে। তবে এখানে নয়, এখান থেকে পঞ্চাশ হাত নীচের দিকে। বাঘটা ঐখানেই তার আহার সমাপ্ত করে ফেলেছিল। চুলে ঢাকা মাথার খুলি আর বাঁ পায়ের গোড়ালির অংশটুকু ছাড়া কিছুই ছিল না।”

একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করে আমি সেদিকে তাকালাম যেখানে সেই পনের বছরের অভাগিনীর দেহ ঐ নরখাদক ভক্ষণ করেছে। আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম জলের দিকে।

অকস্মাৎ জলের পাশের ভেজা বালির উপর চোখ পড়ল। দ্রুতপায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম সেখানে। ভেজা বালিতে বাঘের পায়ের টাটকা ছাপ। কিছুক্ষণ আগে…আমরা আসবার পূর্বমুহূর্তেই বাঘটা জলপান করে গেছে। জল খেতে আসে এমন বহু প্রাণীর ভিড়ে লুকিয়ে থাকা ঐ ছাপ আমার অভিজ্ঞ চোখকে ফাঁকি দিতে পারলো না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম প্রতিটি রেখা, তীব্র এক চিন্তা মুহূর্তে আমার মগজে এল। বাঘটা হয়ত এখনও এই তল্লাট ছেড়ে যায়নি, হয়ত কাছে-পিঠে কোন ঝোপ বা পাথরের আড়াল থেকে আমাদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে।

আমি ইসারায় লোকগুলোকে চুপ করতে বললাম। ফিস ফিস করে বললাম, “তোমরা এই নালা ধরে সন্তর্পণে গ্রামে ফিরে যাও। খুব সাবধানে যাবে। আশেপাশে বাঘ অপেক্ষা করছে।”

লোকগুলো সাহসী ছিল। তারা আমার কথামত আগুপিছু মুখ ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে নীচের দিকে নেমে গেল।

পরমুহূর্তেই আমি আমার কর্তব্য ঠিক করে নিলাম। বাঘের পায়ের ছাপ আমার পিছনের পাথুরে টিবি ডিঙ্গিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে। আমি গায়ের কোটটা খুলে পাথরের ফাঁকে বড় বড় কঞ্চির গায়ে লটকে দিলাম। আর একটা টুপি কোটের উপর বসিয়ে দিলাম। দূর থেকে টুপি কোট পরা একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে মনে হবে।

পাহাড়ের দিকে পিছন ফিরে কোন লোক ঢালুর দিকে যেন চেয়ে আছে স্থিরভাবে। ক্ষিপ্রগতিতে আমি সাত ফুট ওপর থেকে পাথরের গোড়ায় নেমে পড়ে দুটো পাথরের খাঁজে রাইফেল খাড়া করে সেকেণ্ড গুণতে লাগলাম।

আমার প্রথম ধারণা হোল বাঘ ওটাকে মানুষ মনে করে তার ওপর লাফ দেবে, এবং টুপি কোট সমেত সে আমার সামনে বালির ওপর ছিটকে পড়বে। আর দ্বিতীয় ধারণা, যদি সে অন্যদিক দিয়ে আক্রমণ করে তবে সে আমার রাইফেলের পাল্লার মধ্যে হাজির না হলে আমাকে দেখতে পাবে না। দুই পন্থাই আমার মনোমত হোল।

আমার চোখ দুটো পাথরের ফাঁকটুকুর মধ্যে দিয়ে আকাশে নিবিষ্ট। এই ফাঁকের অংশটাতেই ডোরাকাটা চিত্রবিচিত্র রংয়ের ঝিলিক খাবে এক্ষুণি। সেই মুহূর্তে আমি উঠে দাঁড়িয়ে চোখের পলকে গুলী করবো···অনুমান, গুলী মাথা কিংবা ঘাড়ে নিশ্চয়ই বিঁধবে।

সহসা জঙ্গলকে বড় থমথমে মনে হোল। ঝড়ের পূর্বাভাষ। আমার প্রতিটি শিরা-উপশিরা দ্রুত রক্তপ্রবাহে সচল হয়ে উঠলো···মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠলো। আশা ব্যর্থ হোল না। কাছেই নরখাদকের গর্জন শুনলাম। এই অঞ্চলে সে রাজকীয় আহার পাচ্ছে। অতএব তার পক্ষে এই বিনা খাটুনির আরামের লোভ ত্যাগ করা মুস্কিল।

আবার গর্জে উঠলো বাঘটা। শব্দটা আরো কাছে মনে হোল···হয় ত পঞ্চাশ গজ দূরে···আমার মাথার ওপরে পিছনদিকে···কিংবা আরো কম দূরেই হয়ত সে টুপি ও কোটের নকল মানুষকে প্রত্যক্ষ করছে···এও হতে পারে সে আমার অবস্থানও জানে।

আমি তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। খুক খুক করে দুবার কাশলাম। নরখাদক ভুল করবে না···চতুর এই প্রাণী মানুষ হত্যা করতে করতে অলস হয়ে পড়ে···কম মেহনতিতে এত উৎকৃষ্ট খাদ্য আর নেই। প্রতিবাদ করবে না···লড়াই করবে না ···বাধা দেবে না এই মানুষ। শুধু একটি চাপা কাতরানি···তার পরেই সব শেষ। লোভ তার উত্তরোত্তর বাড়াই স্বাভাবিক।

চকিতে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল···আমি উৎকর্ণ,···সেফ্‌টি লক্‌ সরিয়ে দিয়ে ট্রিগারে আঙুল ছুঁইয়ে রাখলাম···পাঁচ সেকেণ্ডও পার হয়নি আমার টুপি, কোট ছিট্‌কে পড়লো পাশে···আর নরখাদক ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার রাইফেলের দশ ফুট দূরত্বের মধ্যে···আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে গুলী ছুঁড়বার জন্য লক্ষ্য স্থির করার আগেই মাথায় পেলাম প্রচণ্ড আঘাত। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পাথরের বহির্মুখী উঁচু টুকরোতে

মাথাটা জোরে ঠুকে গেল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গুলী ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল অন্য দিকে···আর সেই সুযোগে বাঘ এক লাফে জঙ্গলে অদৃশ্য হোল।

রাগে দুঃখে···নিজের আহাম্মুকীর জন্য আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছিল ···আপশোষ হোল আরো একজন লোকের মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী। আমার এই মূঢ়তায় বাঘ নিস্তার পেল··· কিন্তু সে কথা পরে।

বাঘ এক লাফে জঙ্গলে অদৃশ্য হোল।

গ্রামে ফিরে এসে শুনলাম, পত্রলেখক দুবেজী আমার খোঁজ করেছেন। দেখা হোল তাঁর সঙ্গে।

বললেন, "এর আগে চারজন শিকারী ঘুরে গেছেন। তাঁরা বলেছেন অত্যন্ত চতুর এই নরখাদক। কিছুতেই কেউ এর নাগাল পাচ্ছে না তাই গ্রাম-বাসীদের মনে আর সাহস নেই। তারা দলে দলে গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে।"

আমি আর আজকের বিফলতার খবরটা শোনালাম না। ওরই ফাঁকে কত শোকসন্তপ্ত পরিবার এসে তাদের আত্মীয়-বিয়োগের মর্মান্তিক কাহিনী শোনালেন।

দুবেজী বললেন, "প্রত্যেক মাসেই দু'-চারজন লোক প্রাণ হারাচ্ছে। গভর্ণমেণ্ট পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, গ্রাম থেকেও প্রচুর উপঢৌকনের বন্দোবস্ত রেখেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউ বাঘটাকে মারতে পারছেন না।"

আমাদের কথাবার্তার মাঝে হঠাৎ একটা গোলমাল শোনা গেল বাইরে। কয়েকটি লোক হাঁপাতে হাঁপাতে এল, বললে, "বাবুজী! বাবুজী! এখুনি বাঘটা একটা মোষ মেরেছে এখান থেকে আধমাইল দূরে।

আমি কালবিলম্ব না করে রাইফেল বাগিয়ে ওদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম। জন বিশেক লোক সঙ্গে নিলাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে নিলাম। সন্ধ্যা হতে এখনও ঘণ্টা দুই দেরী। সেখানে গিয়ে পৌঁছতে প্রায় আধঘণ্টা লাগলো।

বাঘটা মোষটাকে পাহাড়ের পাদদেশে মেরে প্রায় দেড়শো ফুট ওপরে টেনে নিয়ে গেছে···একটা মরা বাবলা গাছের আড়ালে মোষটাকে টেনে এনে রেখেছে।

দেখলাম মোষের কোমরের অধেক অংশ সাবাড়। খেতে খেতে এই মাত্র উঠে গেছে আমাদের সাড়া পেয়ে। কাছে গাছ না থাকায় মাচান তৈরী করতে হোল। পরীক্ষা করে নিলাম আমার কাছ থেকে কিলের (kill) দূরত্ব। লোকগুলো হল্লা করতে করতে গ্রামে ফিরে গেল।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ঠিক ছিল না তাই ধরমবীর ও আনন্দকে বলে এসেছিলাম বন্দুকের গুলী শুনলে তারা যেন লোকজন নিয়ে আসে নতুবা সকালে আমার খোঁজ করে।

মাচানের ওপর বসে বসে দেখলাম চারিদিকে পাখীর শোভাযাত্রা। কখনও দু'একটা সম্বর ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে এদিক-ওদিক যাচ্ছে। একটু পরেই একটা কাকর হরিণ হুংকার তুলে মাচানের তলা দিয়ে ছুটে পালাল। বুঝলাম কাছে পিঠেই বাঘ আছে। হতেও পারে সে জলপান করে ফিরে আসছে। খাওয়ায় বিঘ্ন হলে বাঘ বড় বিরক্ত হয় তাই তার গর্জন শুনতে পেলাম সারারাত কিন্তু মুহূর্তের জন্য একবারো কিলের কাছে এল না। কেন আসেনি তা পরে বুঝেছিলাম।

সারারাত কাটলো চিতার ডাক শুনে···হায়েনার খলখলে হাসিতে চমকে উঠলাম ···আর রাতজাগা কয়েকটা পাখীর ডানার ঝটপটানিতে সচকিত হয়েছিলাম।

বনের নিয়মিত বাসিন্দা ওরা। বাঘও তাই। তার ওপর সে সন্দেহপরায়ণ প্রাণী। ফাঁকা জায়গায় এই মাচান দেখে সে বুঝতে পেরেছে এখানে তার মৃত্যু অপেক্ষা করছে···তাই দূরে বসে সে বিরক্তি প্রকাশ করেছে। ক্ষুধার তাড়নায় সে চঞ্চল হয়েছে বারবার, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভুল করে একবারও খাদ্যে মুখ দেয়নি। সকালের দিকে পালে পালে শকুন নেমে এল মরা অর্ধভক্ষিত মোষের ওপর···আর দশ মিনিটের মধ্যে মোষের মাংসল দেহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এরপর দিন পাঁচেক কেটে গেছে। বাঘের আর সন্ধান পাইনি। বনে বনে ঘুরেছি অনেক। ইতিমধ্যে একটা সম্বর, একটা ভালুক ও একটা চিতাবাঘ মেরেছি। কিন্তু যে জন্যে আসা তার কোন সংবাদ পেলাম না।

সেদিন দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম নিচ্ছি হঠাৎ খবর পাওয়া গেল বাঘ

আবার আর একটা নরহত্যা করেছে। যে খবর দিতে এসেছিল তার সঙ্গেই রাইফেল হাতে রওনা হয়ে গেলাম।

দুই মাইল পথ অতিক্রম করার পর কারয়াবাদ পেরিয়ে ঘুঁটীবাদ গ্রামে এলাম। এইখানেই গ্রামের মোড়লের ছেলে নিহত হয়েছে। মোড়লের একমাত্র ছেলে। মোড়ল পাগলের মত হয়ে গেছে। ঘটনায় জানা গেল জঙ্গলের ধার দিয়ে গ্রামের পথে মোষের গাড়ি চালিয়ে আসছিল ছেলেটা। গাড়িতে ছিল গমের বস্তা। হঠাৎ একটা শুকনো নালার কাছে মোষ দুটো দড়ি ছিঁড়ে ডাকতে ডাকতে ছুটে পালাল···আর পরমুহূর্তেই ছেলেটাকে বাঘ কামড়ে তুলে নিল গাড়ি থেকে।

দেখলাম ছেলেটাকে। রক্তমাখা সারা অঙ্গ। বাঘটা ঠিক আগেকার মত কাঁটা ঝোপের পাশে টেনে এনেছে। খাওয়া তখনও তার শুরু হয়নি। আমরা এসে পড়াতে সে বিরক্ত হয়ে দূরে অপেক্ষা করছে নিশ্চয়ই।

আমি বললাম, "ছেলেটাকে সরিয়ে নাও। এখানে একটা মোষ বেঁধে দাও।"

ছেলেটার শিয়রেই ছিল একটা ঘোড়া নিম গাছ। শিকারের অত্যন্ত উপযুক্ত স্থান বলে মনে হোল।

মোড়ল ছেলেকে সরাতে রাজী হোল না। দেখলাম কতকগুলো তীর-ধনুক আনিয়েছে সে।

ছেলেটার তিন দিকে খুঁটি পুঁতে ধনুকগুলোকে বাঁধলো। তারপর ধনুকের ছিলার সঙ্গে দড়ি বেঁধে লাশটার চারপাশে জড়িয়ে রেখে দিল। পরে ধনুকে টান দিয়ে তীর ঘাটকে রেখে দিল। তীরের লক্ষ্য রইল মৃতদেহের ওপরে। উদ্দেশ্য মৃতদেহ নড়াচড়া করলেই ছিলা নড়ে উঠবে এবং সেই সঙ্গে তীর ছুটে যাবে আক্রমণকারীর দিকে। পরে জেনেছিলাম ঐ সব তীরের ফলায় মাখানো ছিল তীব্র বিষ। ওরা ফিরে যেতেই আমি গাছে চড়ে বসলাম। ডালপালার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে মৃতদেহের ওপর নজর রাখলাম।

আমার পিছন দিকে, মিনিট পাঁচেক পরে খস খস শব্দ হোল। আস্তে আস্তে আড়-চোখে দেখলাম বাঘ আসছে। কুকুরের মত মাথা নীচু করে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে···থমকে দাঁড়ালো আমার গাছটার তলায়।

সন্দিগ্ধভাবে ধনুকগুলোর আওতার বাইরে পায়চারী করলো। আবার ফিরে এল গাছতলায়। চুপ করে কিছুক্ষণ বসলো। হাই তুললো একবার, শক্ত চোয়ালের দাঁতগুলো পড়ন্ত রোদের ঝলকে ঝিকমিকিয়ে উঠলো। আড়ামোড়া ভেঙে আবার উঠে দাঁড়ালো এবং আবার লাশটার চারপাশে ঘুরতে লাগলো।

হঠাৎ থেমে মাথা নীচু করে ঝাঁপিয়ে পড়লো লাশটার ওপর আর সঙ্গে সঙ্গে

তীব্র গর্জনে সারা জঙ্গল কেঁপে উঠলো। আমি ঐ একই সঙ্গে মাথা লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লাম। শিকার ছেড়ে দিয়ে প্রচণ্ড লাফে বাঘ আমার গাছের তলা দিয়ে অদৃশ্য হোল। আমি তাড়াতাড়ি নেমে এলাম। আশ্চর্য হোলাম, ধনুক-গুলো থেকে সব তীরই বেরিয়ে গেছে।

বাঘটার কোন স্পন্দনই পেলাম না···

বাঘের পথ অনুসরণ করে আমি ছুটে চললাম। বাঘের পায়ের ছাপে তীব্র নজর রেখে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। আহত বাঘ মরণকামড় দেবে হাতের কাছে পেলে। কোথাও ওৎ পেতে হয়ত বসে আছে। হুঁসিয়ার হয়ে গাছের আড়ালে হেঁটে চললাম।

এক জায়গায় দেখলাম প্রচুর রক্ত। সেই রক্ত বিন্দু বিন্দু হয়ে এগিয়ে গেছে-নালার দিকে। সম্ভবতঃ ঠাণ্ডা পাবার আশায় সে ছুটে এসেছে এদিকে। পাথরে পাথরে লাফ খেতে খেতে নালার কাছে এলাম আর সেখানেই আবিষ্কার করলাম বাঘটা শুয়ে রয়েছে ভিজে বালিতে।

পা টিপে টিপে পিছন দিক থেকে বাঘটার দশ ফুটের মধ্যে এসে গেলাম। বাঘ নিশ্চল অবস্থায় শুয়ে ছিল। আমি রাইফেল উঠিয়ে অনেকক্ষণ লক্ষ্যস্থির করে গুলী ছুড়লাম।

বাঘের কোন স্পন্দনই পেলাম না। তারপর ঢিল ছুড়েও যখন কোন সাড়া পেলাম না, তখন রাইফেলের নল দিয়ে মাথাটাতে ঠেলা দিলাম আস্তে। চাপ চাপ রক্তে মাথাটা কালো হয়ে উঠেছে। সারা অঙ্গই যেন কালো হয়ে গেছে। অবাক বিস্ময়ে দেখলাম একটা তীর বিঁধে রয়েছে বাঘের তলপেটে।

আবার যখন ফিরে এলাম গাঁয়ে তখন দলে দলে লোক বাঘটাকে কাঁধে করে শোভাযাত্রায় বেরিয়েছে।

বহু বৎসর পরে গ্রামের লোকেরা আবার স্বাভাবিক কাজকর্মে যোগদান করবে তাই তাদের এত আনন্দ। কিন্তু আমার আনন্দ হোল কৈ? সেদিনের দায়িত্ব-হীনতার জন্যে শেষপর্যন্ত একজন কিশোরকে জীবন দিতে হোল এই অন্তর্জ্বালা বুকে কাঁটার মত খচ খচ করছে। বৃদ্ধের একমাত্র পুত্র আজ নেই, তাই সকলের আনন্দের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। এর জন্যে কি আমিই দায়ী? একজন শিকারীর পক্ষে এটা একান্তই একটা অমার্জনীয় ভুল। নরখাদক বাঘ নয়, আমি।

উচিত শাস্তি

—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বারিক

দুষ্টু ছেলে খেলনা চুরি করলো দোকান থেকে,
দোকানদারের চোখ এড়িয়ে রাখলো জামায় ঢেকে।
পেছন থেকে একটি ছেলে নজর রেখেছিল
চোর ছেলেটার গর্দানেতে রদ্দা কষে দিল!
বললে, "পাজি, চোরাই খেল্‌না কোথায় নিয়ে যাস্‌?"
চোর বলে, "থাম্‌, বেশ করেছি, চোপরও বদমাস্‌!"
এই না শুনে দোকানী আর খরিদ্দারের দল,
রেগেই আগুন চোরকে ঘিরে লাগায় কোলাহল।
চাঁটির পরে পড়লো চাঁটি, কিলের পরে কিল,
থাপ্পড়ে দাঁত ভাঙলো চোরের, কেউ মারলো ঢিল।
খেলনাটাও গুঁড়িয়ে গেল দারুণ ভীড়ের চাপে,
মারের চোটে রক্ত ঝরে, থরথরিয়ে কাঁপে।
দুষ্ট ছেলের দুর্দশাতে দোকানদারের মনে
জাগলো দয়া, চোরকে তখন বললে সঙ্গোপনে ঃ
"উচিত মতো শাস্তি পেলে, রক্ত হ'ল জল
দেখলে খোকা কেমন হ'ল চুরি করার ফল!"

ধ্রুব সেন—আজাদী

—শ্রীঅলককুমার ঘোষ

"মেকং নদীর যুদ্ধ?"—ধ্রুব সেন সরু গোঁফজোড়ায় পাক দিতে দিতে বলল—"আজাদী ফৌজের যে সিপাহী প্রথম পেরিয়েছিল মেকং নদী, সে এই আপনাদের সমুখে।"

খানা-টেবিলের চার পাশে যে বারো-চৌদ্দ জন সামরিক অফিসার ধ্রুব সেনের গল্প শুনছিলেন, তাঁদের চোখের কোণে কোণে হাসির ঝিলিক খেলে গেল। এই বাচ্চা বাঙালীটা আর বড়াই করবার জায়গা পেল না? ঝুনো জাপানী সেনানায়ক এঁরা সবাই; যে-লোক কথা কয় বেশী তার দ্বারা যে কাজ তেমন হয় না—এটা ভাল-রকমই এঁদের জানা আছে। এই আজাদী ক্যাপ্টেনটাকে এঁরা একদম বাজে-মার্কা বলে বাতিল করে দিলেন।

বেচারী ধ্রুব! ও কিন্তু বাজে-মার্কা আদপেই নয়। বাজে-মার্কা হলে কি নেতাজী ওকে রংবাক পাঠান এ-রকম একটা জরুরী কাজের ভার দিয়ে? জাপানী জেনারেল ইয়োমাৎসুর কাছে একটা পুলিন্দা পৌঁছে দেবার জন্য সে এসেছে। এমন সব দলিলপত্র আছে সে পুলিন্দায়, যা একান্ত বিশ্বাসী লোক ভিন্ন কারও হাতে দেওয়াই যায় না। বিশ্বাসী এবং মরিয়া! শত্রুর হাতে পড়লে জান দেবে, কিন্তু কাগজ দেবে না!

এমনি লোকই বাচ্চা ধ্রুব সেন!

অথচ—বরাতের ফের, জাপানীরা ওকে অপদার্থ ঠাউরে বসল আর আকারে-ইঙ্গিতে হাসি তামাসায় তাদের মনের ভাব প্রকাশও করতে লাগল।

কোমরের তরোয়াল ঘড়াং করে বাজল সান-বাঁধানো মেজেতে। ধ্রুব সেন উত্তেজিত হয়ে উঠল।

বলল—"আপনাদের এ হাসি তামাসা—একে আমি আমার প্রতি অপমান বলে ধরে নিচ্ছি। দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি আপনাদের। প্রকাশ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ নিষেধ হলেও, গোপনে আর্মিতে এ-জিনিস চিরদিন চলে আসছে, তা আপনারাও জানেন, আমিও জানি।"

কিয়োৎসুকো মেজর মানুষ, ধ্রুবর চাইতে উঁচুপদের লোক। কাজেই ধ্রুবর কথার ঢং তাঁর পছন্দ হল না। অপমান? হয়ে থাকে অপমান ত' হয়েছে। তার জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধ? জাপানীরা হারি-কিরি করছে অহরহঃ, সেই জাপানীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ভয় দেখানো? এ-ছোকরাকে আক্কেল দেওয়া দরকার।

তিনি ব্যঙ্গের সুরে বললেন—"দ্বন্দ্বযুদ্ধ? হ্যাঁ, দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে বই কি! তা, কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান আপনি? আমরা ত' জন চৌদ্দ রয়েছি এখানে!"

"চৌদ্দ জনের সঙ্গেই!"—ধ্রুব সেন দ্বিধামাত্র না করে জবাব দিল—"চৌদ্দ জনের সঙ্গেই! পাঁচ মিনিটের বেশী সময় আমার লাগবে না কারো জন্য! পাঁচ চৌদ্দং সত্তর মিনিট—সত্তর মিনিটের মত নিরিবিলি পাওয়া যায়—এমন একটা জায়গা চাই। আর কখন আপনাদের সুবিধে হবে বলুন!"

জাপানী অফিসারদের সবই যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল ; এ ছোকরা বলে কি ? পাঁচ পাঁচ মিনিটে এক একটা জঙ্গী জাপানীকে খতম করবে ? সত্যিই ওর এমনি ক্ষমতা আছে, না, এও ওর একটা ভড়ং ?

"জায়গা আছে !" একজন উত্তর দিলেন—"ঐ যে ছাউনির পিছনে বড় বটগাছটা দেখছেন, ওর ওধারে পাঁচিল-ঘেরা বাগান আছে একটা, কেউ সেখানে থাকে না। আর সময়—কাল ভোর পাঁচটায়।"

তরোয়াল খুলে সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে ঘর ছেড়ে যাবে ধ্রুব সেন, এমন সময় সেখানে ঢুকলেন কর্ণেল সিগেরু।

"ভাই সব ! একজন ভলান্টিয়ার চাই !"

লাফিয়ে এগিয়ে এল চৌদ্দজন জাপানী অফিসারই।

"যারা বিবাহিত, তারা বাদ !"

বিমর্ষভাবে ঘাড় নেড়ে পিছিয়ে পড়ল আটজন।

ছয়জন বুক ফুলিয়ে কর্ণেলের সমুখে দাঁড়িয়ে আছে ; কর্ণেল বললেন—"রংবাক সহরে ঢুকতে হবে।"

"নিশ্চিত মৃত্যু !"—ছয়জনের একজন বলল—"নিশ্চিত মৃত্যু ! কিন্তু তাতে আমি রাজী !"

"আমিও !" "আমিও !"—একে একে সবাই বলল—"আমিও রাজী !"

ধ্রুব সেন এগিয়ে এসে অভিবাদন করল কর্ণেলকে।

কর্ণেল তাকে লক্ষ্য করেননি এতক্ষণ। লক্ষ্য করবার পরে খুশীও হলেন না বোধহয়। "এ আমাদের একটা ঘরোয়া ব্যাপার, কাপ্তেন সেন !"—বিরসভাবে এই কথা ধ্রুবকে বলে আবার ফিরলেন জাপানীদের দিকে।

ধ্রুব নাছোড়বান্দা। সে বলল—"কথাটা ঘরোয়া বটে, কিন্তু আমিও ত' ঘরেরই লোক ! আজাদ ফৌজে আর জাপানী ফৌজে যখন সহযোগিতা চলছে, তখন রংবাকে ঢুকবার অনুমতি আমিই বা দাবি করতে পারব না কেন ? তা ছাড়া আর একটা ব্যাপার আছে—যেটা বিবেচনা করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, জাপানী অফিসার কাউকে না পাঠিয়ে আমায় পাঠানোই আপনার উচিত—।"

হাসি পেল কর্ণেলের—"কী সে ব্যাপার ?"

"সে-ব্যাপার হল এই—কাল যদি যুদ্ধ হয়, এই সব সুযোগ্য অফিসারের কোন একজনের স্থান শূন্য থাকা বাঞ্ছনীয় হবে না। আমার কোন স্থান নেই জাপানী ফৌজে ; কাজেই আমার অভাবে আপনাদের কোন ক্ষতি হবে না।"

*　　*　　*　　*

কর্ণেল তাকে নিয়ে গেলেন সেনাপতি ইয়োমাৎসুর কাছে। সেনাপতি বললেন—"নেতাজীর দৌত্য তিনি যেভাবে সম্পাদন করেছেন—রংবাকে ঢুকে কাজ হাঁসিল করে আসাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে না বোধ হয়। ওঁকে এ-সময় পাওয়া গেছে এটা আমাদের সৌভাগ্য। পাঠাও ওঁকে।"

কর্ণেল ধ্রুবকে দিলেন একটা ক্ষুদে কাঁচের শিশি। "রংবাকের লোকেরা কাউকে বন্দী করলে তখুনি যে তার মাথা কেটে ফেলে, তা নয়। আগুনে পোড়ায় কখনো কখনো ; জ্যান্ত অবস্থায় চামড়া

তুলে নেওয়ার খবরও পেয়েছি! কাজেই বন্দী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই শিশির বিষটুকু গলায় ঢেলে দেবেন। ব্যস্! এক সেকেণ্ড!"

তারপর তিনি দিলেন ওকে একটা বৌদ্ধ ভিক্ষুর আলখাল্লা। "এইটে পরে ঢুকুন সহরে।"

ধ্রুব আপত্তি করল—"ছদ্মবেশ পরলেই গুপ্তচরের স্তরে নেমে যেতে হবে।"

"তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই!" কর্ণেল জবাব দিলেন—"গুপ্তচর হন বা না হন, বন্দী হলেই ত' মরতে হবে!"

ভিক্ষুর সাজ পরে ধ্রুব সেন রওনা হল। তরোয়াল রেখে দিয়ে কোমরে গুঁজল একখানা লম্বা ছুরি।

একজন সৈনিক তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ছাউনি ছাড়িয়ে আধ মাইল অন্ততঃ। তার পর শুরু হল রংবাকের সীমানা। সহরটা প্রাচীন; সেকেলে পাথরের দেয়াল আর বড় বড় পাথরের ইমারত। মোড়ে মোড়ে প্যাগোডা। একটা দেয়াল জাপানীরা দখল করে, সমুখে আর একটা দেখা যায়। দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে একটা প্যাগোডা হয়ত কেড়ে নেওয়া হল, রাস্তার মোড়েই তখন গড়ে উঠল রংবাকীদের নতুন ঘাঁটি কোন একটা বিহার বা বিদ্যালয় বা হাসপাতালে। প্রতি রাস্তা একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এই সহরে। প্রত্যেকটা বাড়ি পরিণত হয়েছে এক একটা দুর্গে।

জাপানী ফৌজের একেকটা দল সহরের বিধ্বস্ত অংশে পাহারা দিচ্ছে। অবরুদ্ধ রংবাকে কোন দিক থেকে সাহায্য না আসতে পারে, তাই দেখছে। তাদের পেরিয়ে চলে গেল ধ্রুব সেন।

তার সঙ্গী সৈনিক তাকে অবশেষে পৌছে দিল একটা বড় গাছের তলায়। বলল—"এই গাছে উঠে ঐ বাড়ির ছাদে নামতে পারবে। তারপর তোমার ভাগ্য আছে, আর তুমি আছ।"

ধ্রুব উঠল গাছে। আধাআধি উঠতে না উঠতেই থামতে হল তাকে। ছাদে কার পায়ের শব্দ!

রংবাকীরা পাহারায় আছে!

পায়ের শব্দ এগিয়ে এল!

অল্প জ্যোছনা। একটা লোক বন্দুক হাতে চলে আসছে। ছাদের কিনারে এসে দাঁড়াল। তার পরই করল গুলি। অমনি নীচে থেকে শোনা গেল আর্তনাদ।

বেচারী সৈনিক! ধ্রুবকে গাছে তুলে দিয়ে সে বুঝি মমতার বশে একটুখানি দেরী করছিল! ছাদে উঠে ধ্রুব কোন-একটা ইশারা করে বিদায় নেবে—এইটুকু ছিল তার প্রত্যাশা হয়ত! যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমনি কোমলতার ছোঁয়াচ কখনো কখনো সৈনিকদের প্রাণে লাগে বই কি!

সেই কোমলতার এই পুরস্কার! বন্দুকের গুলি!

ধ্রুব নীরবে হাত কামড়াতে লাগল। তার টুঁ শব্দটি করবার জো নেই! দুশমনের হাতে বন্দুক! ধ্রুবর হাতে শুধু ছুরি!

তা ছাড়া গোলমাল করলেই শত্রুরা দলে দলে এসে পড়বে? যে-কাজে সে যাত্রা করেছে, তা সূচনাতেই হবে পণ্ড!

বন্দুকওয়ালা নেমে আসছে!

গাছের তলায় কী আছে, দেখতে চায় সে।

গাছ বেয়ে সে নেমে আসছে—ধ্রুবর ছুরি তার বুকে বিঁধে গেল আমূল।

* * * *

ছাদে উঠে সিঁড়ি দেখতে পেল ধ্রুব সেন। সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে একেবারে রাস্তায়। বাড়িতে লোক আছে বলে মনে হয় না; যুদ্ধক্ষেত্রের বর্তমান সীমানা এই বাড়ি, এখানে অবশ্য লোক এখন না থাকারই কথা।

কর্ণেল তাকে সব কিছু বলে দিয়েছিলেন।

আন্দাজ এক মাইল ভিতরে ঢুকতে হবে। সেখানে একটা পার্ক আছে। সহরের বহু রাস্তাই গিয়ে মিলেছে সেই পার্কে। সেই পার্কের এক পাশে বড় প্যাগোডা। সেই প্যাগোডার বাঁয়ে যে-রাস্তা, ঢুকতে হবে তাতেই। একদিকে একটা মুচির দোকান, আর একদিকে একটা মদের দোকান—মাঝখানে যে দরজা, সেই দরজায় ঢোকা চাই। ঐ বাড়িতে বাস করে হোসিমা নামে এক জাপানী। সে জাপানী ফৌজের গুপ্তচর। সহরের দক্ষিণ সীমায় যে বৌদ্ধবিহার, তারই পিছনের দিক দিয়ে যাতে জাপানীরা সহরে ঢুকতে পারে, তারই ব্যবস্থা করবার ভার সে নিয়েছে।

ভার নিয়েছে, কিন্তু আজ তিন দিন হোসিমার কোন খবর নেই। প্রতি রাত্রে জাপানী ফৌজ দক্ষিণের বৌদ্ধবিহারের পিছনে ওত পেতে থাকে, কিন্তু কোন উপায় হোসিমা করে না।

ধ্রুবকে দেখে আসতে হবে হোসিমার কী হয়েছে। বেঁচে আছে, না মরে গেছে? বেঁচে যদি থাকে, তবে তার দ্বারা কাজটা হয়ে উঠবে কিনা? যদি না হয়, তা হলে ইয়োমাৎসুকে অন্য পথ ধরতে হবে।

ইয়োমাৎসুর আক্ষেপ মনে পড়ে গেল ধ্রুবর। সেনাপতি দুঃখ করে বলছিলেন—"একখানা প্লেন আমার এখানে নেই, নেই একটা প্যারা-সৈনিক। থাকলে কি আর হোসিমার ভরসায় বসে থাকি?"

ধ্রুব বিনীতভাবে আশ্বাস দিয়েছিল—"প্লেন বা প্যারাসুট যখন আবিষ্কার হয় নি, তখনও ত সেনাপতিরা দুর্গ জয় করতেন! চেষ্টা করলেই উপায় হয়।"

* * * *

রংবাক জয় কেমন করে হবে—এই রাত্রের ভিতরই তার উপায় ধ্রুবকে করতে হবে। কাজ হাসিল না করে ফিরে যাওয়া—ধ্রুবর কোষ্ঠীতে ওটা লেখে না। হোসিমা যদি কোন উপায় করতে না পেরে থাকে, ধ্রুব নিজেই করবে তার উপায়।

বাড়িটার ভিতর থেকে রাস্তায় পড়তেই ধ্রুব দেখে—এক নোংরা গলি। সে যে কী নোংরা, কেউ তা কল্পনাও করতে পারবে না। ঘর বাড়ি ভেঙ্গে চুরে পড়ে আছে, তারই মাঝে মাঝে পড়ে আছে পশু ও মানুষের পচা মড়া। জ্যান্ত মানুষ মড়ার পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে—দু'চার পা যেতে না যেতেই এমন দৃশ্য ধ্রুবর চোখে পড়ে গেল।

ধ্রুবর সঙ্গে কথা কইবার জন্য অনেকেই চেষ্টা করল বটে, কিন্তু অতিমাত্র ব্যস্তভাব দেখিয়ে, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি"—আওড়াতে আওড়াতে ধ্রুব সেন চলে গেল তাদের পাশ কাটিয়ে।

নোংরা গলিটা অবশেষে গিয়ে পড়ল বড় রাস্তায়, বড় রাস্তাও এক সময় মিশল গিয়ে বড় একটা পার্কে। ঠিক! ঐ যে পার্কের পাশে প্যাগোডা! ওরই বাঁয়ের রাস্তায় মুচির দোকান আর মদের দোকানের মাঝে—

দরজা খোলা নয় বটে, কিন্তু ঠেলতেই খুলে গেল। সূচীভেদ্য অন্ধকার! আলো জ্বালতেও সাহস হয় না, কি জানি হোসিমা ছাড়া অন্য লোকও ত' থাকতে পারে এ-বাড়িতে!

হঠাৎ একটা কাতরানি কানে এল ধ্রুবর। মাথার উপর থেকে আসছে শব্দটা। জাপানী ভাষা যেটুকু জানা ছিল ধ্রুবর তাইতেই সে বুঝল—'জল, জল' বলে কাতরাচ্ছে কোন মুমূর্ষু লোক।

চট্ করে দেশলাই জ্বেলে ফেলল সে।

কী সর্বনাশ!

মাথার উপরেই বটে!

দেয়ালে গজাল মেরে লটকে রাখা হয়েছে একটা লোককে। তার মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে বুকের উপরে, জিভটা বেরিয়ে পড়েছে এতখানি!

ঘরের কোণে জলের পাত্র দেখতে পেয়ে ধ্রুব তাড়াতাড়ি সেটা মুখের কাছে তুলে ধরল লোকটার।

জল খেল সে।

অনেকখানি জল খেয়ে সে যখন থামল, ধ্রুব চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল—"আপনি কি হোসিমা?"

"হাঁ! আপনি?"

নিজের পরিচয় দিল ধ্রুব।

তখন হোসিমা তাকে বলতে লাগল নিজের কথা। থেমে থেমে অতি কষ্টে। নিজের কথা শেষ করে সে বলল—"সব আয়োজন শেষ করে এনেছি, এমন সময় ধরা পড়ে গেলাম। আমি যে বারুদের সাহায্যে কোন-একটা বাড়ি উড়িয়ে দিয়ে জাপানী ফৌজকে সহরে ঢোকাতে যাচ্ছি এটা দুশমনেরা জেনে ফেলে তারই শাস্তি দিয়েছে এই গজালে ঝুলিয়ে। তবে ঠিক কোথায় কোন্ বাড়ি ওড়াব তা ওরা জানে না। সেটা তোমাকে বললাম; তুমি এখন যা করবার, তা কর। সেনাপতি ইয়োমাৎসুকে বলবে—পিতৃভূমির জন্য আমি প্রাণ উৎসর্গ করেছি। আজ তিন দিন এই মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছি। মৃত্যুর জন্য কত যে প্রার্থনা করছি, কিন্তু মৃত্যু ত' আসে না!"

কাঁচের শিশিতে বিষ ছিল ধ্রুবর কাছে। জলের ভিতর সেই বিষ মিশিয়ে হোসিমার মুখে তুলে দিল ধ্রুব। "বন্ধু! তোমায় মুক্ত করা অসম্ভব আমার পক্ষে। কিন্তু তোমার যাতনার অবসান আমি করতে পারি। এই বিষ পান করে তুমি মুক্ত হও।"

* * * *

দক্ষিণ প্রান্তের সেই মহাবিহার। সেখানে ঘরে ঘরে ধ্রুবর মত ভিক্ষুবেশী বহুলোক। সে কতকটা নিরাপদ মনে করল নিজেকে।

বারুদঘরে পরিণত হয়েছে এর একটা কক্ষ। এই ঘরের ভিতরেই পলতে চালিয়েছে হোসিমা। সে-পলতের শেষ প্রান্ত আছে পাশের ঘরের একটা বুদ্ধমূর্তির পায়ের তলায়।

ওদিকটায় যাওয়া যায় কী ভাবে! বারুদঘরের পাশ দিয়ে যেতে দেবে কি! দু' দুটো পাহারাওয়ালা রয়েছে বন্দুক উঁচিয়ে।

হঠাৎ ধ্রুব দেখল—একটা কূপ। তার পাড়ে অনেক বালতি। দুই চারজন জলও তুলছে এত রাত্রে। অবরুদ্ধ সহরে লোকের দিবারাত্রি ভেদ ঘুচে গিয়েছে। ধ্রুবও দুই বালতি জল তুলে দুইহাতে ঝুলিয়ে ব্যস্তভাবে উঠল বারান্দায়। পাহারাওয়ালাদের পাশ দিয়েই চলে গেল। তারা তাকিয়েও দেখল না।

বালতি-হাতে ধ্রুব ঢুকল গিয়ে বারুদখানার পাশের ঘরে। সে-ঘরে আসনে বসে জপ করছেন এক ভিক্ষু। হঠাৎ ধ্রুবর এভাবে আবির্ভাব দেখে তাঁর তপস্যা গেল ভেঙ্গে। চেঁচিয়ে উঠে তিনি নিজের ভাষায় যা বললেন—তার অর্থ বোধ হয়, "এখানে নয়, এখানে নয়, আমার জল চাই না।"

কিন্তু ধ্রুব তাঁর ভাষা বোঝে না। বুঝলেও জলের বালতি অন্য ঘরে বয়ে নিয়ে যাওয়ার তাগাদা তার ছিল না। জলের বালতি ঠক্ করে মেজেতে নামিয়ে সে দড়াম্ করে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল; এবং হতভম্ব ভিক্ষু ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতে না উঠতেই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখটা বেঁধে ফেলল তাঁর। নিরীহ লোকটাকে ছুরি মারতে তার প্রবৃত্তি হল না, যদিও তাতে সময় বাঁচত অনেকখানি।

ততক্ষণে দরজা-বন্ধের দড়াম্ শব্দ এবং ভিক্ষুর আধা-চীৎকার শুনে বারুদখানার প্রহরীরা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। তারা শুরু করেছে হাঁকডাক। চারিদিক থেকে দৌড়ে এসেছে বহুলোক। রুদ্ধদ্বারে ধাক্কা দিচ্ছে তারা।

ভিক্ষুকে ভাল করে বেঁধে রেখে দোরের ভিতরদিককার দুটো খিলই ভাল করে এঁটে দিল ধ্রুব। বেশ মজবুত দরজা। হঠাৎ ভেঙ্গে পড়বার ভয় নেই।

অবশ্য বেশী সময়ের দরকারও নেই ধ্রুবর।

ঐ যে বুদ্ধমূর্তি!

কাঠের দরজা ভেদ করে বন্দুকের গুলি ঢুকল ঘরে। এখানে একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটছে, তা আর বুঝতে বাকি নেই কারও। বারুদখানা পাশেই! এ লোক নিশ্চয়ই হোসিমার দলের লোক!

গুলির উপর গুলি। একটা গুলি কান ঘেঁসে বেরিয়ে গেল ধ্রুবর, ঠিক সেই মুহূর্তে বুদ্ধমূর্তির পায়ের তলা থেকে পলতে টেনে বার করল সে। দেশলাই জ্বেলে সেই পলতের প্রান্তে লাগিয়ে দিতেই—আধ মিনিটের ভিতর—

একটা নারকীয় ব্যাপার! হাজার বাজ গর্জে উঠল যেন! থর থর করে কেঁপে উঠল পৃথিবী ধ্রুবর পায়ের নীচে। তার মাথায় কী-একটা ভেঙ্গে পড়ল যেন; সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

* * * *

ইয়োমাৎসু সসৈন্যে ঢুকলেন এসে রংবাকে! বিহারের দক্ষিণ-দেওয়াল সমস্ত ভূমিসাৎ হয়েছে। ধ্রুবর মাথায় আঘাত লেগেছে বটে, কিন্তু আর কোন ক্ষতি হয়নি।

ইয়োমাৎসু ধ্রুবকে আলিঙ্গন করে ধন্যবাদ দিলেন। "মহামানব নেতাজীর যোগ্য সৈনিক তুমি! আজ ভোরে এই রংবাকে তুমি চা খাবে আমার সাথে!"

ধ্রুব বলল—"নিশ্চয়ই! কিন্তু ছয়টার পরে জেনারেল! একটু কাজ আছে ততক্ষণ!"

"আবার কাজ?"—জিজ্ঞাসা করলেন বিস্মিত সেনাপতি।

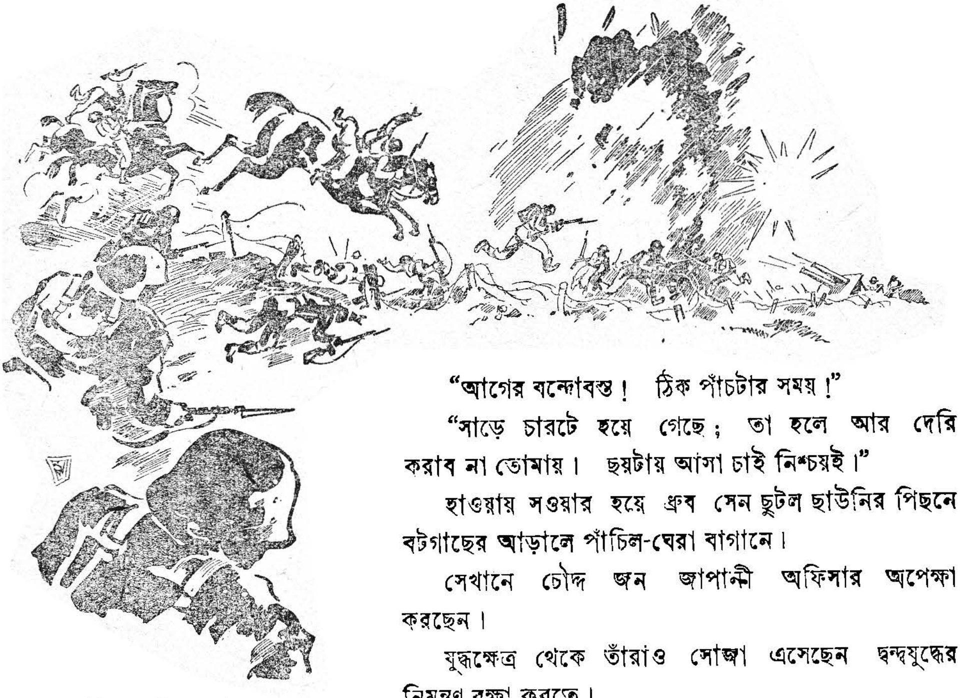

একটা নারকীয় ব্যাপার!

"আগের বন্দোবস্ত! ঠিক পাঁচটার সময়!"

"সাড়ে চারটে হয়ে গেছে; তা হলে আর দেরি করাব না তোমায়। ছয়টায় আসা চাই নিশ্চয়ই।"

হাওয়ায় সওয়ার হয়ে ধ্রুব সেন ছুটল ছাউনির পিছনে বটগাছের আড়ালে পাঁচিল-ঘেরা বাগানে।

সেখানে চৌদ্দ জন জাপানী অফিসার অপেক্ষা করছেন।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাঁরাও সোজা এসেছেন দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

ধ্রুব সেন এসেই তলোয়ার খুলল—"বন্ধুগণ! পাঁচটা বাজল ঠিক। ছয়টায় সেনাপতি ইয়োমাৎসুর সঙ্গে চা খেতে হবে আমাকে। কাজেই মাথা পিছু পাঁচ মিনিট সময় দেবার উপায় নেই আমার। ওটাকে তিন মিনিট বা দুই মিনিট করে নিলে, আশা করি আপনারা দুঃখিত হবেন না।"

এই বলে তরোয়াল হাতে এগিয়ে আসতে উদ্যত হয়েই সে যা দেখল—তা হঠাৎ প্রথম দৃষ্টিতে চোখের ভুল বলেই মনে হল তার। এক লাইনে দাঁড়িয়ে চৌদ্দ জন জাপানী অফিসার তরোয়াল খুলে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করছেন তাকে!

বীরই বোঝে বীরের মর্যাদা!

অজানার উজানে

—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

[সারাংশ। দিঘার সমুদ্রধারে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল দীপক। হঠাৎ সেইখানে তার সঙ্গে হাতাহাতি বেধে যায় নরওয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন বান্নুর সঙ্গে। মারামারির সময় তার সঙ্গে আর একজন লোকের পরিচয় হয়, তার নাম 'ওলাফ'। ওলাফের সঙ্গে দীপকের চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল। পরে দীপক জানতে পারে 'ওলাফ' তারই পূর্বপুরুষ রঘুনাথ রায়ের বংশধর।

সহরে আসে তারা। ওদিকে 'বান্নু' জয়গ্রামের জমিদার হলধরের কাছ থেকে রঘুরায়ের গুপ্তধন খোঁজবার অধিকার লাভ করে। ওলাফের কাছ থেকে সে সে-কথা জানতে পারে। ওলাফ দীপককেও সেই গুপ্তধনের কথা বলে এবং জয়গ্রামে যাবার জন্য তারা প্রস্তুত হয়। এমনি সময় বান্নুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাদের। বান্নু মারপিট করতে থাকে, ফলে সকলকেই থানায় যেতে হয়। গ্রামের সেরা উকিল নিরাপদবাবু আসেন বান্নুর জামিনের জন্যে কিন্তু হলধরের চাকর ভীমের সাহায্যে জেল ভেঙ্গে বান্নু পালায়। আর ভীমেরই হাতে বন্দী হয়ে জয়গ্রামে প্রেরিত হন নিরাপদবাবু।

হলধরবাবু কুকুর নিয়ে জয়গ্রামের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ ওলাফকে দেখতে পান। ওলাফ তখন জ্বরে বেহুঁস। হঠাৎ ওলাফ বিকারের ঝোঁকে গুলি করে হলধরবাবুর প্রিয় কুকুরকে। ফলে সেও বন্দী হলো তাঁরই হাতে। দীপক গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে আসে, কিন্তু ওলাফকে দেখতে পায় না। একটা উঁচু জায়গায় উঠতে গিয়ে দীপক পড়ে যায় মাটির তলায়। মাটির নীচে প্রাসাদ। সপরিবারে জমিদার হলধর সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। 'ওলাফের' শুশ্রূষার ভার নিজ হাতে তুলে নেন হলধরের স্ত্রী। সেখানে বান্নুও এসে উপস্থিত হয়। সবার অলক্ষ্যে সে যায় 'ওলাফকে' খুন করতে। তাকে বাধা দিতে গিয়ে আহত হন নিরাপদ উকিল।]

ছয়

সহরে হুলুস্থুল ব্যাপার।

আজ তিনদিন নিরাপদ উকিলের কোন খোঁজ নেই।

সেই সন্ধ্যায় থানায় তিনি এসেছিলেন। হাজতী আসামী বীয়ার্ণফ ওরফে বান্নুর সঙ্গে দেখা করতে। দেখা হয়েও ছিল। তার পরই একটা তুল-কালাম ব্যাপার শুরু হয় থানার ভিতর। বাইরের পাহারাওলাদের বেধড়ক্ পিটোতে শুরু করে, একটা দৈত্যের মত মানুষ। আলোটালো তখনো বেশী জ্বালা হয়নি; দুই একটা যা জ্বলছিল, তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় ঐ মানুষটা। থানার ভিতরের সিপাহীরা লাঠি-সোটা নিয়ে বেরিয়ে আসে, আর তাদের চোখে ধুলো দিয়ে ঐ মানুষটা ঢুকে যায় থানার ঘরের মধ্যে। এদিকে গোলমালের সুযোগে নিরাপদর সমুখ থেকে ছুট মারে বান্নু। নিকুঞ্জবাবু হাঁক পাড়তে পাড়তে তার পিছু ধাওয়া করেন। সে ঢুকে পড়ে অশোকবাবুর খাস-কামরায়। সেখানে বান্নুর মামলার ফরিয়াদী দু'জন ভদ্রলোক বসেছিলেন; তাঁদের সঙ্গে জড়াজড়ি হয় বান্নুর। তাঁরা কায়দা ক'রে ফেলেও ছিলেন বান্নুকে, কিন্তু হঠাৎ পিছনের জানালা ভেঙে সেই দৈত্যটা ঘরে ঢোকে এবং বান্নুকে কাঁধে ক'রে নিয়ে পালিয়ে যায়। কেউ ধরতে পারেনি তাদের।

এই পর্যন্ত গল্পটা বেশ বোঝা যায়।

তার পরের ব্যাপারটা বোঝা যায় না। বান্নু পালাবার পর নিরাপদবাবু নিজের বাড়ি ফিরে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু বাড়ি তিনি যাননি। সেই সন্ধ্যা থেকে আজ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে যাননি ভদ্রলোক। রাত্রেই তাঁর খোঁজে বাড়ির লোকেরা থানায় এসেছিল। রাত্রেই জোর তদন্ত শুরু হয়; কারণ নিরাপদবাবু সহরের একজন সেরা উকিল। হাকিম-জানিত লোক। তাঁকে খুঁজে বার করবার জন্য পুলিস সহরের প্রত্যেকখানা পাথর উল্টে ফেলে; কিন্তু পাওয়া যায়নি তাঁকে।

তদন্তের ভার স্বভাবতঃই এসে পড়েছে অশোকের উপরে। কারণ থানার ইন্‌স্পেক্টর সে।

কথা হচ্ছিল অশোক আর নিকুঞ্জ দারোগাতে।

নিকুঞ্জ বলছেন—"যেটা সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক—সেটা হল এই যে, বান্নুর সঙ্গে নিরাপদবাবুর যোগ-সাজস ছিল। বান্নুকে হাজত থেকে বার ক'রে নেওয়ার জন্যই তিনি থানায় এসেছিলেন; এবং সে পালিয়ে যাওয়ার পর তিনি নিজেও তার সঙ্গে গা-ঢাকা দিয়েছেন।

অশোক হাসল।

নিকুঞ্জও একটু হেসে নিলেন। এটা সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু নিরাপদ-বাবুকে যারা জানে—তারা মনে করবে এরকমটা ঘটা অসম্ভব। নিরাপদবাবুর মত

লোক একটা বিদেশী বোম্বেটে কাপ্তেনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে বে-আইনী কাজ করবেন, এ ত' ধারণা করাই যায় না!

অশোক বলল—"শুধু তাই নয়। বে-আইনী কাজ করবার দিকে তাঁর আগ্রহই বা হতে যাবে কিসের জন্য? তিনি চিরকাল আইনের মর্যাদা রক্ষার জন্যই ত লড়েছেন!"

নিকুঞ্জবাবু মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "নিঃসন্দেহ। যাকে অপরাধী বলে অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করতেন, তার মামলা কখনো নেন নি নিরাপদবাবু। কাজেই এ-ব্যাপারে তিনি একটা হাজতীকে পালাবার সুযোগ ক'রে দেবার জন্য থানায় এসেছিলেন, এমনটা মনে করাই পাগলামি। আমি ত কিছু ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু আসামীটা পালাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও লুকিয়ে পড়ার কী অর্থ আর করা যায়, বলুন।"

"একটা অর্থ করা যেতে পারে"—অশোক বলল—"আর একটা অর্থও করা যায়। তবে সেটাও সমানই অসম্ভব। সে অর্থটা হ'ল এই যে পালাবার সময় আসামীটাই নিরাপদবাবুকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।"

নিকুঞ্জবাবু আকাশ থেকে পড়লেন—"যে রক্ষক, তাকেই ভক্ষণ করবে লোকটা?"

"খুবই আশ্চর্য ঠেকছে—", স্বীকার করল অশোক। "আশ্চর্য ঠেকছে খুবই। কিন্তু এ-ছাড়া আর হতেই বা পারে কী? ঐ লোকটার সঙ্গে নিরাপদবাবুর সম্পর্কটা যে কী ছিল, তা আমরা কেউ জানি নে! জানতে পারলে হয়ত একটা সূত্র পাওয়া যেত।"

"সম্পর্ক?"—ভ্রূ কুঁচকে নিকুঞ্জ দারোগা অশোকের দিকে চাইলেন।

"নিরাপদবাবু তার সঙ্গে দেখা করতে থানায় আসেন কেন?"—প্রশ্ন করল অশোক।

এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায় নিকুঞ্জর নয়, সুতরাং তিনি চুপ ক'রে রইলেন। অশোকই নিজের চিন্তাসূত্র অনুসরণ ক'রে বকে চলল—"দেখা করতে যখন এসেছিলেন, তখন বুঝতে হবে—মামলায় ওর পক্ষ সমর্থন করার মতলব তাঁর ছিল। সে-মতলব তাঁর হয় কেন? তিনি নামকরা উকিল; মক্কেলের অভাব তাঁর নেই। তিনি নিজে থেকে থানায় ছুটে আসবেন—একটা বিদেশী মক্কেল পাকড়াবার জন্য, এটা বিশ্বাস করা যায় না।"

নিকুঞ্জ মাথা নাড়লেন—"কথা খুবই ঠিক।"

"তাহ'লে?"—অশোক উৎসাহিত হ'য়ে উঠল—"নিজে থেকে যখন তিনি

আসেননি, তখন ধরে নিতে হবে, কেউ তাঁকে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছে। বান্নু নিজে ত অনুরোধ করবার সময় পায়নি! কারণ সে হাজতে আসার পরে এক ঘণ্টার ভিতরই নিরাপদবাবু থানায় এসেছিলেন।"

"তা ছাড়া"—নিকুঞ্জবাবু বললেন—"আমি ত উপস্থিত ছিলাম! আমার সমুখেই ত বান্নুর সঙ্গে নিরাপদবাবুর কথা হয়! বান্নুর কথায় স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল—দু'জনের মধ্যে কোন পরিচয় নেই। তার প্রথম প্রশ্নই হ'ল—কে তুমি? কী দরকার আমার কাছে?"

"নিরাপদবাবু কী উত্তর দিয়েছিলেন সে-প্রশ্নের?"—উৎসুক হ'য়ে জানতে চাইল অশোক।

"উত্তর? উত্তর?"—মাথা চুলকোতে লাগলেন নিকুঞ্জ। "সে উত্তরটা ত শুনেছি বলে মনে প'ড়ছে না!"

—একটু কাচু-মাচু হ'য়ে নিকুঞ্জ বললেন—"মন দিইনি ওদের আলাপের দিকে। ভেবেছিলাম মামলার সময় কী ভাবে আসামীর পক্ষ সমর্থন করা যেতে পারে—নিরাপদবাবু সেই কথাই জানতে এসেছেন। মামুলী ব্যাপার ভেবে মন দিইনি।"

"একটু ভুল করেছেন দাদা!" —অশোক একটা হতাশার ভঙ্গী করল। "অবশ্য আপনি মন দেবার সময়ও বেশী পাননি; তার পরেই থানার বাইরে মারপিট শুরু হ'য়ে গেল। বান্নুও এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।"

একটু চুপ ক'রে গেল অশোক। তারপরই চিন্তিত ভাবে বলতে শুরু করল আবার—"ধরে নিন—বান্নুর কোন বন্ধু আছে। বেশ প্রতিপত্তিশালী বন্ধু—যার এক কথায় নিরাপদবাবুর মত উকিল সারাদিনের খাটুনির পর আবার সন্ধ্যেবেলায় থানায় ছুটে এসেছেন। সেই বন্ধুর একমাত্র উদ্দেশ্য—কী উদ্দেশ্য হ'তে পারে দাদা?"

নিকুঞ্জবাবু চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলেন অশোকের দিকে। কী উদ্দেশ্য হ'তে পারে—মাথায় আসছে না ভদ্রলোকের।

"একমাত্র উদ্দেশ্য হ'তে পারে এই যে নিরাপদবাবুর সঙ্গে কথা কইবার জন্য বান্নু লক্-আপ থেকে বাইরে আসার সুযোগ পাবে, এবং সেই সুযোগে পালাবে। ওকে পালাবার সুযোগ দেবার জন্য সেই বন্ধুই একটা দৈত্যের মত অচেনা লোককে থানায় পাঠিয়ে দেয় দাঙ্গা বাধাবার জন্য। সেই বন্ধু কে? ঐ মিশ্‌কালো পালোয়ানটাই বা কে? একজনকে পেলে আর একজনকে পাওয়া যাবে। এবং আমার বিশ্বাস নিরাপদবাবুর খবরও তা হ'লে পাওয়া যাবে।"

অশোক উঠল। "আপনি একবার হাসপাতালে যান দাদা, বান্নুর যে-সঙ্গী আহত হ'য়ে হাসপাতালে আছে, তার খবর নিন। কাল তাকে কথা কইতে দেননি ডাক্তারেরা, এতই সে অসুস্থ ছিল। আজ যদি একটু সুস্থ হ'য়ে থাকে—তবে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিন, ক্যানিউট জাহাজ থেকে লরিতে চ'ড়ে শহরে আসার পরে ওরা কোথায় গিয়েছিল, কার কার সাথে দেখা করেছিল। আমি যাই জেলখানায়—হারুন ওরফে হারুর কাছ থেকেও এই খবরগুলোই জানবার চেষ্টা করি। থানায় থাকতে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে ত জানা যায়নি কিছু! দেখা যাক আবার!"

*　　*　　*　　*

নাঃ!

হাসপাতালে গুলোর অবস্থা মোটেই ভাল নয়; তাকে কথা কইতে দিতে ডাক্তারেরা আজও নারাজ।

আর হারু?—সে খেঁকিয়ে ওঠে, গালিগালাজ দেয়। কোন কথারই উত্তর পাওয়া যায় না তার কাছে।

অশোক অতঃপর দেখা দিল নিরাপদবাবুর বাড়িতে। ছেলেরা বাড়িতে আছে। অন্যদিন এ সময়ে তারা কেউ কলেজে, কেউ স্কুলে যায়। কিন্তু এ-কয়দিন বাড়িতে শোকের ছায়া নেমেছে; তারা আর বাড়ি থেকে বেরোয় না, সবাই ভয়ে ভয়ে আছে—কখন কী বিপদ ঘটে, কখন কী নতুন দুঃসংবাদ আসে!

অশোক তাদের চেনা। বড় ছেলে তারাপদকে ডেকে সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলিয়ে সে, বলল—"তোমার বাবার বসবার ঘরটা একবার দেখতে হবে ভাই। কেন তিনি থানায় গিয়েছিলেন—কোন ক্লু যদি খুঁজে পাওয়া যায়।"

তারাপদ তাকে নিয়ে গেল বসবার ঘরে।

টেবিলের উপর থাকে থাকে কাগজের তাড়া; উল্টে-পাল্টে দেখল অশোক। কোথাও এমন-কিছু নেই, যাতে এ-ব্যাপারের উপর বিন্দুমাত্র আলোকপাত হ'তে পারে।

দেওয়ালের গায়ে গায়ে আলমারি, তাতে মোটা মোটা আইনের বই। ডাইনে বাঁয়ে র‍্যাক, তাতে গাদা গাদা ব্রিফ। ডায়েরী, ক্যালেণ্ডার, পাঁজি—সব আছে; নেই কেবল সেই জিনিসটা—যা অশোকের দরকার।

ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি আছে একটা। তাতেও কিছু নেই। হতাশ হ'য়ে পড়ল অশোক।

চেয়ারের ঠিক সামনে ব্লটিং প্যাড। তার তলায় কিছু নেই—সাতবার পরখ করা হ'য়ে গিয়েছে। এবার সে ব্লটিংখানা প্যাড থেকে খুলে ফেলল। অনেক সময় দরকারী কাগজ প্যাড আর ব্লটিংয়ের মাঝখানে লুকানো থাকে, তা সে জানে।

নাঃ, তাও নেই।

ব্লটিংখানা আবার প্যাডে পরাতে লাগল সে।

পরিষ্কার দু' লাইন বাংলা লেখা।

এ কী? এ কী?

প্যাড থেকে খুলে মনের ভুলে ব্লটিংয়ের ভিতর দিকটা উপরে রেখেছিল। এখন সেই অবস্থাতেই প্যাডের ভিতর পূরতে গিয়ে সে দেখে—

পরিষ্কার দু' লাইন বাংলা-লেখা।

চিঠি লিখে ব্লটিংয়ের উপর চেপে ধরা হয়েছিল, কালি শুষবার জন্য। ছাপ যে-পিঠে পড়েছিল, এটা তারই উল্টো। ছাপটা উল্টো দিকেই সোজা ফুটেছে। লেখাটা এই—

"হলধরদা, তোমার পত্র পেলাম। আমি এখনই থানায় গিয়ে তোমার লোকের সঙ্গে দেখা করব ও তার জামিনের চেষ্টা করব।

তোমার নিরাপদ—।"

[ক্রমশঃ

খেলার আসর

—শ্রীসাংবাদিক

ফুটবল লীগ—কলকাতার প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ খেলার প্রথমার্ধ সমাপ্তির মুখে। ফিরতি লীগেরও এক আধটা খেলা হয়ে গিয়েছে। এবারকার ফুটবল লীগ এখনও ঠিক জমে ওঠেনি, তবে ফিরতি লীগের শুরুতেই খেলা জমে উঠবে আশা করা যায়। এখন লীগ কোঠায় প্রথম চার পাঁচটি ক্লাবের খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

মোহনবাগান ক্লাব এ পর্যন্ত ১৭টি খেলার মধ্যে ৮টি খেলায় 'ড্র' ক'রে ৮টি পয়েন্ট নষ্ট করেছে। তবে প্রথম ডিভিসনের ১৫টি ক্লাবের মধ্যে একমাত্র মোহনবাগানই এখন পর্যন্ত অপরাজিত আছে। এসিয়ান গেম-ফেরতা কেম্পিয়া, আমেদ হোসেন ও চুনী গোস্বামীর উপর মোহনবাগানের খেলার যে উন্নতির আশা করা গিয়েছিল তার কোন পরিচয়ই এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এবারকার নতুন খেলোয়াড়দের মধ্যে রমনই ভাল খেলছেন। কেরালার ব্যাক রবীন্দ্রম পায়ে চোট লাগায় খেলতে পারছেন না। পুরনো খেলোয়াড়দের মধ্যে কেম্পিয়ার খেলা কিছু চোখে পড়ে।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৫টি খেলে ৪টি 'ড্র' ও ১টিতে পরাজিত হয়ে মোট ৬টি পয়েন্ট নষ্ট করেছে। সালাম, রহমতুল্লা ও ওমর এসিয়ান গেম খেলে ফিরে এসেছে। অবশ্য ওমর ভারতীয় দলের হয়ে খেলেননি, খেলেছিলেন পাকিস্তানের হয়ে। সম্প্রতি এই তিনজন খেলোয়াড় ফিরে আসার দরুণ মহমেডান দলের খেলা আরও ভাল হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম তিনটি খেলায় পরপর জয়লাভ করলেও একাদিক্রমে পরের পাঁচটি খেলায় 'ড্র' করেছে। পরে দু'টি খেলায় পরাজিত ও আর একটি খেলায় 'ড্র' করে মোট ১০টি পয়েন্ট নষ্ট করেছে। ইস্টবেঙ্গলের খুবই দুর্ভাগ্য যে তারা এবারে মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং দু'-দলেরই কাছে পরাজিত হয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের নারায়ণ ও বীরবাহাদুর এসিয়ান গেম থেকে ফিরে এসেছে। তবুও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলার কোন বিশেষ উন্নতি দেখা যায়নি।

রাজস্থান ক্লাব চারটি শক্তিশালী দলের মধ্যে অন্যতম বলা যায়। দলগত শক্তি অনুযায়ী রাজস্থান ক্লাবের ভাল খেলা উচিত; কিন্তু ভাল খেলতে পারছে না কেন জানা যায় না। এ পর্যন্ত রাজস্থান ১৫টি খেলার মধ্যে ৫টি 'ড্র' ও ৫টি খেলায় পরাজিত হয়েছে। নতুন খেলোয়াড়দের মধ্যে নামকরা খেলোয়াড় প্রকাশ সিংয়ের সম্বন্ধে যতখানি আশা করা গিয়েছিল তিনি ততখানি খেলতে পারছেন না।

ইস্টার্ণ রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব লীগ দৌড়ে এখনও সমানতালে পাল্লা দিয়ে চলেছে। অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত রেলওয়ে দল ভালই খেলছে। তবে শেষ পর্যন্ত কী হবে কে জানে। রেলওয়ে দল শক্তিশালী মহমেডান স্পোর্টিংকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়ে বিস্ময়ের সূচনা করেছে। এই খেলাটিকে এ-বছরকার শ্রেষ্ঠ খেলা বলা যেতে পারে। রেলওয়ে দলের প্রদীপ ব্যানার্জি ও নিখিল নন্দী এসিয়ান গেম থেকে ফিরে নিজ ক্লাবে যোগদান করায় তাদের খেলার আরও উন্নতি হয়েছে। এ পর্যন্ত রেলওয়ে দল ১৩টি খেলে ৭টি পয়েন্ট নষ্ট করেছে।

সোনার বাংলা

—শ্রীমধুসূদন মজুমদার

[৬]

কালচুরী! উৎকলী! অভিযানের পর অভিযান!

তারপর কর্ণাটী চালুক্য!

চালুক্য যুবরাজ বিক্রমাদিত্যের আক্রমণে কামরূপ-সীমান্ত পর্যন্ত পদানত!

সহসা রুদ্ধ তাঁর অগ্রগতি। কর্ণাট থেকে দূত এল দ্রুতগামী অশ্বে। "পিতা তব মৃত্যুশয্যা'পরে! ফিরে চল স্বদেশে কুমার!"

"সাজো, সাজো কর্ণাটবাহিনী"—প্রচারিত হ'ল যুবরাজের আদেশ।

তেজঃপুঞ্জ-কান্তি বীর সামন্তসেন এসে অভিবাদন করলেন বিক্রমাদিত্যকে।

"কী সংবাদ সামন্তসেন?"

"স্পর্ধা আমার মার্জনা করুন, যুবরাজ!" সামন্তসেন সবিনয়ে নিবেদন করলেন প্রভুকে—"আমি ফিরে যাব না কর্ণাটে।"

"ফিরে যাবে না কর্ণাটে?"—যুবরাজের বিস্ময়ের সীমা নেই; "কেন ফিরে যাবে না?"

"আমি ভালবেসেছি এই সুন্দর দেশকে। গৌড়বঙ্গের স্নিগ্ধ শ্যাম সৌন্দর্য মুগ্ধ করেছে আমার অন্তরকে। আমি বাস করতে চাই এদেশে।"—উত্তর করেন কর্ণাটী বীর।

"বাস করতে চাও?" তিক্তস্বরে প্রশ্ন আসে যুবরাজের কণ্ঠ থেকে—"কী সাহসে বাস করতে চাও শত্রুপুরীতে, একান্ত একাকী?"

মৃদুহাস্য খেলে গেল সামন্তসেনের অধরকোণে—"শত্রুপুরী? আপনি বাঙ্গালীকে ভুল বুঝেছেন সম্রাটপুত্র! বাঙ্গালী কারো শত্রু নয়। যতক্ষণ আপনার সশস্ত্র বাহিনী এ-দেশের বক্ষ জুড়ে অনাচার ক'রে ফিরবে, ততক্ষণই বাঙ্গালী করবে প্রতিরোধ। আপনার সৈন্য যে মুহূর্তে চলে যাবে বঙ্গ-সীমান্ত থেকে, সেই মুহূর্তেই আশ্রিত কর্ণাটীকে ভাই ব'লে কোল দেবে পরম স্নেহে।"

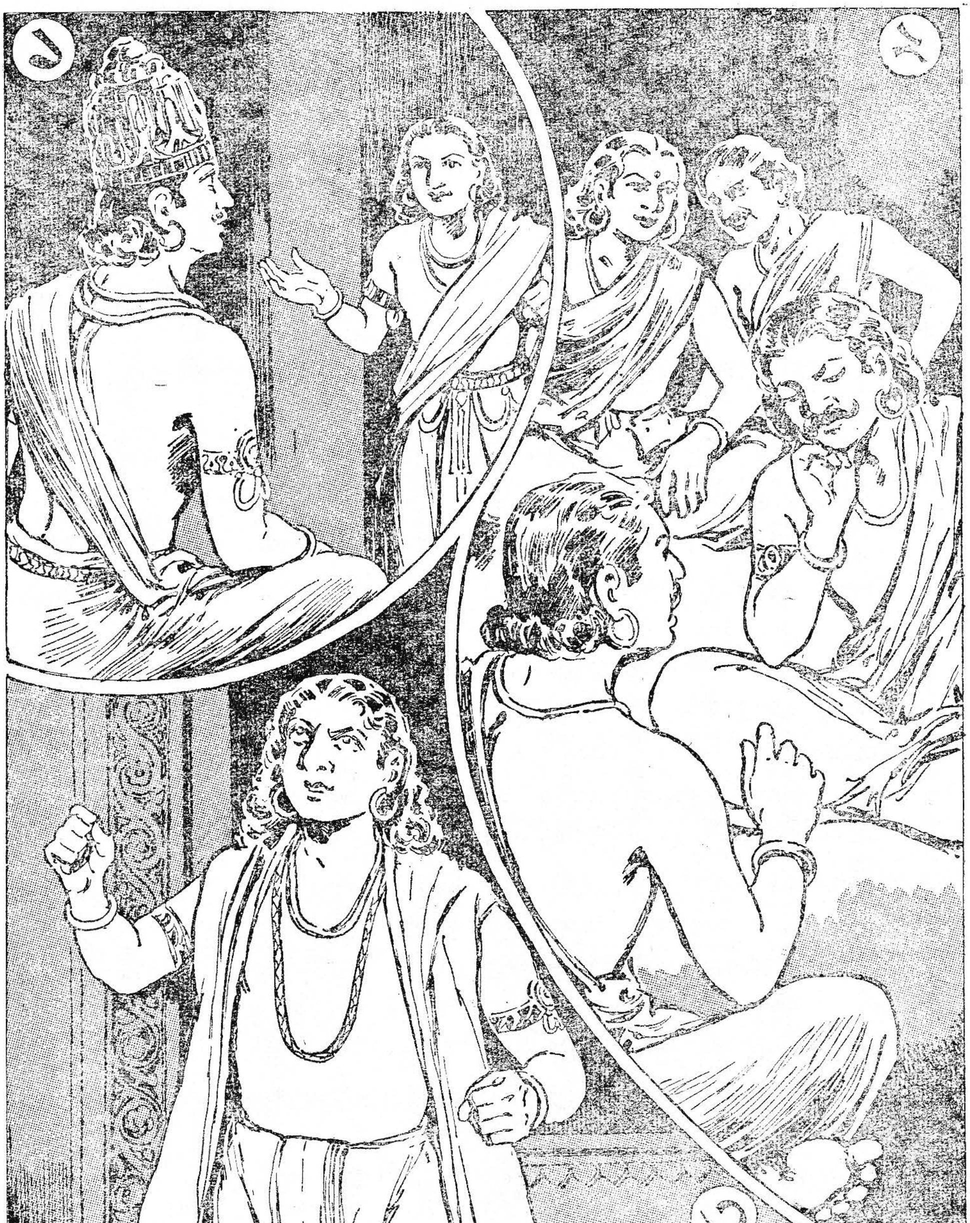

১নং। “আমি বাস করতে চাই এদেশে”—উত্তর করলেন কর্ণাটী বীর।
২নং। নায়ক মহানায়কগণ অসন্তুষ্ট, বিদ্রোহী।
৩নং। বরেন্দ্রী উদ্ধার! বা সর্বধ্বংস!—এই হ'ল রামপালের পণ।

সৈন্য নিয়ে চ'লে গেলেন বিক্রমাদিত্য। সামন্তসেন র'য়ে গেলেন বাংলায়, গঙ্গাতীরে। কায়মনে বাংলাকে গ্রহণ করলেন নিজের দেশ ব'লে। বাঙ্গালীকে গ্রহণ করলেন স্বজন ব'লে।

বাঙ্গালী তাঁর স্নেহের প্রতিদান দিল অর্ধশতাব্দী পরে, তাঁরই বংশধরকে বাংলার সিংহাসনে বসিয়ে।

সামন্তসেনই বাংলার সেন রাজগণের আদিপুরুষ।

সিংহাসনে আসীন পাল বংশের অযোগ্য বংশধর—মহীপাল দেব।

দিকে দিকে নায়ক মহানায়কগণ অসন্তুষ্ট, বিদ্রোহী।

কৈবর্তপতি দিব্যোক তাদের অগ্রণী।

বরেন্দ্রভূমে উড়িয়ে দিলেন বিদ্রোহ-পতাকা।

মহীপালের ধমনীতে দেবপাল ধর্মপালের রক্ত কি এক বিন্দুও অবশিষ্ট নেই ?

আছে!

পাল বংশের বিজয়কেতন পতপত উড্ডীন হ'ল বরেন্দ্রীর আকাশে; সূর্যকরে ঝলসে উঠল ভল্ল তরবারি; রণ-মাতঙ্গের বৃংহণে গুরুগুরু কম্পিত হ'ল রণক্ষেত্র।

কিন্তু রাহুগ্রস্ত ভাগ্যরবি। মহীপাল পরাজিত ও নিহত।

বরেন্দ্রীতে নব নৃপতি দিব্যোক। প্রভুদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত করলেন প্রজারঞ্জনে।

গৌড় সিংহাসনে রামপাল—হৃতগৌরব, হতমান, হীনবল।

কিন্তু অন্তরের ঐশ্বর্যে বলবান।

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্"—গীতার মহাবাক্য সংগীতের মত অহর্নিশি বাজে তাঁর বক্ষের নিভৃতে।

বরেন্দ্রী উদ্ধার! বা সর্বধ্বংস!—এই হ'ল রামপালের পণ। আবার রণডঙ্কা বেজে উঠল গঙ্গার তীরে।

[চলবে

বোম্বেটে আর ডানপিটে

[চলবে

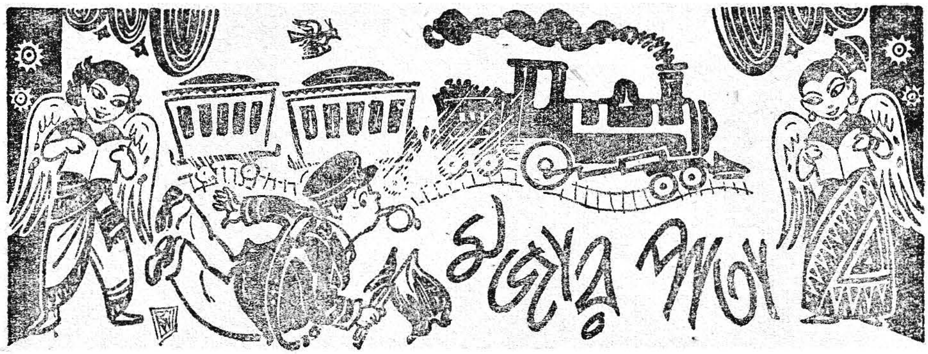

নূতন ধাঁধা

১। প্রথমার্ধ একটা সংখ্যা, দ্বিতীয়ার্ধ তোমারও আছে আমারও আছে, সমস্তটা মিলিয়ে যা হয়, তা আকাশে ঘোরে।

—বিজন ও সুজন রায়—শিলচর, আসাম।

২। কী সেই প্রসিদ্ধ নাম, যা উপাধি ভেদে কখনো বিপ্লবী, কখনো ব্যবহারজীব।

—অপর্ণা সেনগুপ্তা—আগরতলা।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। শাবল (শাব=শাবক)। ২। রত্নগিরি।

৩। নরওয়ে (নর=সংস্কৃত)।

গত মাসের ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—কাঞ্চন, সব্যসাচী, অনিরুদ্ধ, সাবর্নি, শিবাজী ও শ্রীজ্ঞান—কাশীপুর ; মৈত্রেয়ী, আত্রেয়ী, কস্তুরী, দেবাহুতি, পম্পা, শম্পা, উষ্রী ও চৈতালী—কাশীপুর ; শান্তিদেব দত্ত—গরচা সেকেণ্ড লেন ; বিশ্বনাথ পাল ও প্রণবকুমার বসু—বেহালা ; সুহাস গুপ্ত—প্যারীমোহন সুর লেন ; গীতা, ইন্দ্রাণী ও অমৃতা চ্যাটার্জী—রাসবিহারী এভেনিউ ; দীপঙ্কর সরকার—পশ্চিম পুটিয়ারী ; অমিতকুমার সরকার—টালিগঞ্জ।

২৪ পরগনা—সুধীন্দ্র, অময় ও বিষ্টু বসু—বারাসাত ; সুবোধকুমার দাস—খাঁটুরা ; দেবব্রত নন্দী—কাঁচড়াপাড়া ; দীপালি, মেজদি, মেজদা ও সন্তু—১৬৬০৬।

বর্ধমান—জীবেন অধিকারী—ভালাডি স্তাও লাইন ; সুনীল, সুশীল ও তপনকুমার ধারা—সিঙ্গারকোন ; ভূতনাথ, মান্টু, ভক্ত, মা, ইলুদি, ধনা ও কালো—নারায়ণপুর ; নিমাইচাঁদ নন্দন—সিঙ্গারকোন ; মন্মথ, প্রমথ, মদন, লব, কুশ, হারাধন, নিরঞ্জন, বিশ্বনাথ প্রভৃতি—আউশগ্রাম।

মেদিনীপুর—বাণী চক্রবর্তী—গোলগ্রাম ; শীতাংশুশেখর দত্ত পাঠক—১৪৭০৬ ; ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ—চাঁপাপোল আংশিক বুনিয়াদী বিদ্যালয়, বোধনা।

বাঁকুড়া—তুলসী, রথীন, বীরেন, জীতেন, গুরুদাস, আদিত্য ও অশোক— নবীন সংঘ, হেলনা শুশুনিয়া ; তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—হেলনা শুশুনিয়া ; সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়—বাঁকুড়া।

হাওড়া—শীলা সেনগুপ্তা ও পূরবী ঘোষ—হাওড়া ; মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়—কদমতলা।

পুরুলিয়া—নবেন্দু, দিব্যেন্দু ও সুস্মিতা—১৩২৪৫ ; বীরেন্দ্রনাথ পাইন—১৩৪১১।

হুগলী—বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ—চন্দননগর।

পঃ দিনাজপুর—বিমান কুমার—ইটাহার ; অনিন্দ্য মজুমদার—বালুরঘাট।

আসাম—পুলিন, পূর্ণেন্দু, প্রীতিকণা, পরিমল, পরিতোষ, পরাগ, পূরবী, গৌরী প্রভৃতি—হাইলাকান্দি।

উড়িষ্যা—জীবনচন্দ্র চৌধুরী ও সুনীলকুমার বিশ্বাস—কটক-১ ; পাপিয়া, অলকা, গিনীমণি, শ্যামলী, নরেন ও তরী—ভুবনেশ্বর ; উমা আঢ্য—বহরমপুর।

বিহার—ধীরেনকুমার সরকার—১৪৪৯৯ ; বাবলী, মণি ও অপর্ণা চক্রবর্ত্তী—কাটিহার।

দিল্লী—আদিত্যবর্ণ, ইন্দ্রনীল, এবা ও দেবরঞ্জন মিত্র—১৬৫১৮।

ফরিদপুর—খোন্দকার জাহাঙ্গীর রব্বানী ও মাহবুব আলম।

মালদহ—হিমাংশুবিকাশ সরকার—কালিয়াচক।

জলপাইগুড়ি—ফজলুল হক, এজাজুল, আবদুল রশীদ, কনক ও ঝরনা প্রভৃতি—খারিজা বেরুবাড়ী।

বীরভূম—মা, মন্টু, নন্টু, হাঁদু, রানী, বাণী, বীথি, প্রীতি প্রভৃতি—ভবানীপুর।

কাছাড় জেলার ভাঙ্গাবাজার হইতে শ্রীজ্যোতির্ময় দাস আমাদের সহযোগিতায় একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"জ্যোতিঃপ্রসাদ সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়-বস্তু ঃ

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বন করে একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী

[শিকার কাহিনী, ভূতের গল্প, ডিটেক্‌টিভ গল্প, জীবন কথা,
আবিষ্কার কাহিনী, জীবজন্তু-বিষয়ক গল্প]

১। শুকতারার যে-কোন পাঠক-পাঠিকা প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারেন। ২। ভাদ্র-সংক্রান্তি পর্যন্ত রচনা গৃহীত হবে। ৩। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা "শুকতারা" অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। ৪। শুকতারা কর্তৃপক্ষের বিচারই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। রচনার গুণানুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় দু'টি পুরস্কার দেওয়া হবে।

প্রথম পুরস্কার ঃ—দেব সাহিত্য-কুটীরের প্রকাশিত ৪৲ টাকা দামের বই।

দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ—দেব সাহিত্য-কুটীরের প্রকাশিত ২৲ টাকা দামের বই।

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

বন্দে মাতরম্।

পৃথিবী প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে চলেছে। প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে চলেছে মানুষের সভ্যতার রথ, কালকের আবিষ্কার আজ পুরানো হয়ে যাচ্ছে, মানুষ নতুন করে আবিষ্কার করছে নতুন পথ, নতুন মন্ত্র, নতুন উপায়। সামনের দিকে এগিয়ে চলাই তার ধর্ম। কিন্তু এই সামনের দিকে এগিয়ে চলার নেশায় আমরা অনেক সময় পিছন দিককে ভুলে যাই। ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে অতীতকে অবজ্ঞা করি। তখনি হয় বিপদ। কারণ, যত সামনেই আমরা এগিয়ে যাই না কেন, আমাদের রক্তকণিকার ভিতর দিয়ে আমরা অতীতের সঙ্গে বাঁধা। আমার দৃষ্টির অতীত আমার বংশে যে সব পূর্বপুরুষ ছিলেন, তাঁদের চোখের সামনে দেখতে পাই না ব'লেই মনে হয় তাঁদের সঙ্গে বুঝি আমাদের আর নেই কোন যোগ-সম্পর্ক ; কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই আমার মধ্যে বেঁচে আছেন, তাঁদের চিন্তা-ভাবনা, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই আমাদের চিন্তা-ভাবনা আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিশে আছে।

কবে কোন বিস্মৃত দিনে বাল্মীকি রচনা করেছিলেন মানবজীবনের মহাকাব্য। তার সুর, তার ছন্দ, তার ধারাবাহিকতা আজও তোমার-আমার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সৃষ্টির প্রথম ফোটা ফুলের সঙ্গে আজকের দিনের শেষ ঝরাফুলের আছে একটা নিবিড় ধারাবাহিক যোগ ; ইতিহাসের বিস্মৃত প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে, হারিয়ে-যাওয়া প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে আছে বর্তমানের ঘটনা ও মানুষের অবিচ্ছেদ ধারাবাহিক সম্বন্ধ। এই ধারাবাহিকতাকে উপলব্ধি করাই হলো জীবনের চরম সার্থকতা।

বন্ধুগণ, তোমরা এই শ্রাবণ মাসেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি মহাপুরুষদের স্মরণ করবে। স্মরণ করবে হয়ত আরও অনেক মহাপুরুষকে······কিন্তু আমি অনেকবার তোমাদের বলেছি যে, শুধু স্মরণ করার ভিতর দিয়েই মহাপুরুষদের স্মৃতিতর্পণ সম্পূর্ণ হয় না। যদি তাঁদের কার্যকে—তাঁদের আদর্শকে আমাদের জীবনে রূপ দেবার চেষ্টা করি, তবেই রক্ষা হবে তাঁদের স্মৃতির পূর্ণ মর্যাদা। শুধু ফুলের মালায়, শুধু বক্তৃতার বাণীতে কি তাঁদের কাছে আমাদের বিরাট ঋণের কণামাত্রও পরিশোধিত হবে ?

তা হয় না বন্ধু ! আমরা জন্মোৎসব পালন করি—মৃত্যুতিথি উদ্‌যাপন করি, কিন্তু নানা আড়ম্বরের মাঝে আমরা অনেক সময় ভুলে যাই আসল মানুষটিকে। এ যেন প্রাণ-প্রতিষ্ঠাহীন মৃন্ময় প্রতিমার পূজার আয়োজন। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে আগে মনে পড়ছে আমাদের যুগ-নায়ক বিদ্যাসাগরকে। এই শ্রাবণ মাসেই হয়েছিল তাঁরও মহাপ্রয়াণ। প্রতি বছর এমনি দিনে তাঁর মৃত্যুতিথি উদ্‌যাপন করছি, অথচ তাঁর সত্যিকার স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখবার প্রচেষ্টা আমাদের কোথায় ?

তাই আজ বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করে বলতে চাই, আজকের বাঙ্গালীর পক্ষে সবচেয়ে বেশী দরকার হ'ল সেই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে···আমাদের প্রতিদিনের জীবনের ক্ষেত্রে জীবন্ত করে তোলা। ঈশ্বরচন্দ্রকে নতুন করে চিনতে হবে, দেশের তরুণ-তরুণীদের কাছে কিশোর-কিশোরীদের কাছে নতুন করে চেনাতে হবে, বিদ্যাসাগর মানে মাতৃভক্তি নয়, বিদ্যাসাগর মানে বিধবাবিবাহ নয়, বিদ্যাসাগর মানে দয়া দাক্ষিণ্য নয়। বিদ্যাসাগর মানে হলো ইস্পাত, যে ইস্পাত দিয়ে তৈরী হয় জাতীয় চরিত্রের কাঠামো, বিদ্যাসাগর মানে হলো উচ্ছ্বাসহীন বাষ্পহীন বলিষ্ঠ বিপ্লব,······ বিদ্যাসাগর মানে হলো এমন আত্মপ্রতিষ্ঠিত পরুষ-পুরুষত্ব, যা দুঃখের, ব্যথার, বিরূপ অবস্থার ঝড়ে ভেঙ্গে দুমড়ে যায় না। বিদ্যাসাগর মানে হলো দেশপ্রেম, যে দেশপ্রেম মাতৃস্নেহের মতন সহজ সত্য, মাতৃস্নেহের মতন নীরব, লাভালাভে উদাসীন, মাতৃস্নেহের মত যা আঁকড়ে ধরে থাকতে জানে সন্তানের কল্যাণ আয়ুকে।

আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে একটা নেতিয়ে পড়া কাঁদ কাঁদ ভিজে সপসপে ভাব আছে, বিদ্যাসাগর হলেন তার কঠোর প্রতিবাদ। তাই আজ আমাদের দরকার বিদ্যাসাগরকে, দরকার এই মহানীরব বলিষ্ঠতাকে।

ওগো স্বাধীন ভারতের কিশোর-কিশোরী, তেরোই শ্রাবণ এই পরমপুরুষের মহাপ্রয়াণ দিবসে তোমরা তোমাদের অন্তরের সমস্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বল,—

হে মহামানব! আমাদের জীবনে আমরা আবার আকর্ষণ করে আনবো তোমার আশীর্বাদকে···যে মাটিতে তুমি রেখে গিয়েছ তোমার চরণ চিহ্ন, সেই মাটি দিয়ে বিশ্বের কপালে আমরা পরাবো বিজয় তিলক। জয়হিন্দ্। —দাতুমণি।

অধ্যবসায় কোনও বাধাই মানে না

বেহালা নিবাসী শ্রীবিনয়ভূষণ গুপ্তের পুত্র শ্রীমান শেখর গুপ্ত এ বছর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ৬০৩ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ২৬তম স্থান অধিকার করেছে। ১৯৫২ সালে শ্রীমান যখন ৭ম শ্রেণীর ছাত্র তখন থেকে তার দেহের নিম্নাঙ্গ পঙ্গু হয়ে যায়, বিছানায় আবদ্ধ থাকায় সে তার লেখাপড়া বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এ বছর রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে পড়াশুনা করে সে পরীক্ষা দেয়। কালীঘাট স্কুলে সীট পড়ায় বেহালা থেকে প্রতিদিন যাওয়া আসা করার ফলে সর্বাঙ্গ তার ফুলে যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে পরীক্ষা চালিয়ে যায়। শেখরের আদর্শ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরই অনুসরণ করা উচিত।

আবিষ্কার

এক সময় বহু অশিক্ষিত লোক ধর্মের নামে অনেক কুকাজ করতো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় গঙ্গার মোহানায় সাগরদ্বীপে মকর সংক্রান্তিতে সন্তান বিসর্জন। ঠিক এই রকমই আর একটি কুসংস্কার ছিল সশরীরে শিবলোকে যাওয়া। হিমালয়ের কেদারনাথ ও গঙ্গোত্রীর মাঝখানে ১৬০০০ ফুট উঁচু যে উপত্যকা আছে তার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে বহু তীর্থযাত্রী এই পুণ্য অর্জন করতো। সেইজন্য এই উপত্যকার

নাম হয় মৃত্যু উপত্যকা। প্রায় ২০০ বছর আগে এই সব নিষ্ঠুর প্রথাকে আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে উপত্যকার কথাও মানুষ ভুলে যায়। সম্প্রতি "এলাহাবাদ হিমালয় পর্বতারোহণ ক্লাব" এই উপত্যকাটিকে খুঁজে বার করেছেন। আমরা এর জন্য সেই দলের নেতা শ্রীসুরথপ্রসাদ আগরওয়াল সহ সকলকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উপদেশের পরিণাম

অনেক সময় পিতামাতা অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই শিশুকে উপদেশ দেন। এতে অনেক সময় অবাঞ্ছিত ফলও দেখা দেয়। একজন অবাঙ্গালী মহিলা তাঁর পাঁচ বছরের শিশুপুত্রকে শিক্ষা দিতেন যেন সে তার সবকিছু "গঙ্গা মাঈকে" অর্পণ করে। একদিন আহিরীটোলা ঘাট থেকে ওপারে বাঁধাঘাটে যাবার সময় মা'র অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ছেলেটি মা'র মনিব্যাগটি "গঙ্গা মাঈজীকে" সমর্পণ করে। তাতে নাকি নগদ ৩০০৲ টাকা ছিল।

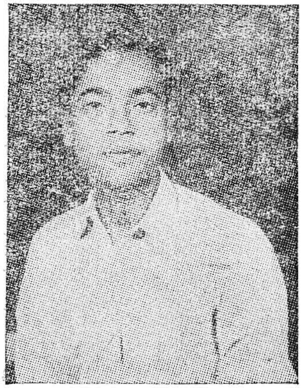

অরুণকিশোর নাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, 'শুকতারা'র একজন উৎসাহী গ্রাহক, বাঁকুড়া নিবাসী শ্রীমান অরুণকিশোর নাগ এ-বছর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি ব'লে গত ১৫ই জুন রেল-লাইনে মাথা পেতে দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।...

প্রতি বছরই পরীক্ষার পর আমরা এই ধরনের দুর্ঘটনার কথা শুনতে পাই। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার ফলে বাংলার তরুণদের এমনিধারা আত্মহত্যা করাকে আমরা জাতীয় দুর্ভাগ্য বলেই মনে করব।

বিদ্যালয়ের পরীক্ষা জীবনের প্রাথমিক পরীক্ষা মাত্র। অবশ্য স্বীকার করি, প্রথম জীবনের যদি সে পরীক্ষা প্রতিকূল হয়ে দেখা দেয়, তা হ'লে সে যে পরম দুর্ভাগ্যের কথা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ দুর্ভাগ্যকে এত মূল্য কোনদিনই দেব না, যার ফলে জীবন নিষ্ফল হয়ে গেল বলে মনে করতে হবে, আর তার ফলে জীবনের সমাপ্তি ঘটাতে হবে। বাধা বিপত্তি আসতে পারে, তাই বলে কি লড়াই না করে জীবন-প্রভাতেই জীবনান্ত ঘটাতে হবে? এ কিন্তু নিছক বোকামী! তা হলে যে পরাজয়কেই মেনে নেওয়া হলো!

সংগ্রামের ভয়ে যারা পরপারে দূরে সরে যায়, তাদের ভীরু, কাপুরুষ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

তাই তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ, যখনই হতাশায় ভেঙে পড়বে, চোখের সামনে দেখতে পাবে না সত্যিকারের পথ, তখন আমাদের একবার স্মরণ কোরো বন্ধু...দেখবে তোমাদের সামনে হয়ত তুলে ধরতে পারবো এমন আলোর শিখা, যা তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। সর্বশেষ প্রার্থনা করি, ভগবান্ অরুণকিশোরের আত্মার কল্যাণ করুন আর সমবেদনা জানাই তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে।

শ্রীসুষমা সেন, বি. এস্-সি সম্পাদিত

হিন্দু নারী

উপন্যাসের ন্যায় গল্পচ্ছলে হিন্দু নারীর কর্তব্য, গৃহকর্ম ও নিত্যপ্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এ ছাড়া পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ মহিলাগণের জীবন-কথা দেওয়া হইয়াছে।

অসংখ্য তিন বর্ণ ছবি…রঙিন জ্যাকেট

দাম আড়াই টাকা।

আশুতোষ মজুমদার সম্পাদিত

মেয়েদের ব্রতকথা

অসংখ্য চিত্র সংবলিত…দাম ২৲

=পূজা-বার্ষিকী=

[প্রত্যেকখানির দাম—৩ টাকা]

১। ছোটদের চয়নিকা　২। ছোটদের গল্প-সঞ্চয়ন—৪৲
৩। ঝলমল　৪। আজব বই—৪৲　৫। শিশু-পল্লিকা
৬। সোনার কাঠি　৭। যাদুঘর　৮। চিত্রদীপ—৪৲
৯। মায়ামুকুর　১০। সোনালী ফসল　১১। মধুমেলা
১২। রূপরেখা　১৩। বর্ষ-মঙ্গল　১৪। আলপনা—৪৲
১৫। রাঙ্গারাখী　১৬। অঞ্জলি　১৭। আবাহন　১৮। উদয়ন
১৯। নবারুণ—৪৲　২০। অভিষেক—৪৲　২১। পরশমণি—৪৲
২২। বসুধারা—৪৲　২৩। ইন্দ্রধনু—৪৲　২৪। দেবালয়—৪৲　২৫। জয়যাত্রা—৪৲

=হেমেন্দ্রকুমার রায়ের=

আলো দিয়ে গেল যারা—২৲

=নরেন্দ্র দেবের=

অনেক দিনের অনেক কথা—২৲

=রাধারাণী দেবীর=

গল্পের আলপনা—২৲

Reg. No. C. 3063 "Suktara"

= মেয়েদের জন্য পৌরাণিক গল্প =

দ্রৌপদী ॥৵০ সীতা ॥৵০
ভারত নারী ॥৵০ কৃষ্ণার্জ্জুন ॥০

সুভদ্রা ঊষা বেহুলা শর্ম্মিষ্ঠা
সাবিত্রী সংযুক্তা শকুন্তলা সতী
শৈব্যা পার্ব্বতী দময়ন্তী চিন্তা
প্রত্যেকখানির মূল্য ॥০ আনা

পূজাবার্ষিকী
নব পত্রিকা
মূল্য ৪৲

= রূপকথা =

গল্পের মায়াপুরী ২৲
ঠাকুরমার ঝুলি ৩৲
ঠাকুরমার গল্প ১৲
ঠানদিদির থলে ৩৲
গল্পের আলপনা ২৲
চীনে গল্প ১৲ রূপকথা ৮০
নিঝুমপুরের স্বপন কথা ১৲
মন ছোটে মোর তেপান্তরে ৮০

অনেক দিনের অনেক কথা ২৲
শোনো শোনো গল্প শোনো ২৲
যত হাসি ততই মজা ২৲
পেস্তার বরফি ১৷০ হাসি কান্না ১৲
জন্মদিনের উপহার ২৲
পুরাণ দিনের পুরাণ গল্প ৩৲

= টার্জান সিরিজ =

টার্জান দি গ্রেট ১৷০
টার্জান ইন্ দি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড ১৷০
অ্যাডভেঞ্চার অব টার্জান ১৲
টার্জান অ্যাণ্ড হিজ্ মেট্ ১৲
টার্জান দি এপ্‌ম্যান ১৷০
টার্জান অ্যাণ্ড দি ট্রেইটর ১৷০
টার্জান ইন্ দি জাঙ্গল ১৷০

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন...দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯